ব্যবসায়ে বাঙালী

বার্মাসেল অয়েল কোম্পানীর এজেণ্ট

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—

কমলা বুক ডিপো লিমিটেড্

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,

গুরুদাস চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স

২০১।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ও

অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

মূল্য এক টাকা

মুখবন্ধ

[আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত]

ধ্বংসোন্মুখ বাঙালীকে ব্যবসাবাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করাই আমার জীবনের অন্যতম সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং আজীবন যথাশক্তি প্রচারকার্য্য দ্বারা এবং হাতে কলমে আমার আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়া আসিতেছি। আমার স্বপ্ন এখনও সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে একথা বলিতে পারি না, তবে তাহা যে আংশিকভাবে সার্থক হইয়াছে তাহার প্রমাণ দেখিতেছি।

হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ক্ষুদ্র সূচনা হইতে যাঁহারা বড় কারবার গড়িয়া তুলিবার শক্তি ধারণ করেন, তাঁহারা প্রশংসার পাত্র। গ্রন্থকার বিজয়বাবু এই শ্রেণীর লোক। ইনি নিজে হীন অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়-সঙ্কল্প বলে ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন—সুতরাং একজন ভুক্তভোগী হইয়া সমস্ত অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা শোনা কথা বা পুঁথিগত বিদ্যা নহে, একজন ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কথা। 'আড়তদারী-পরিচালন,' 'ব্যাঙ্কের সাহায্যে ব্যবসাপরিচালন,' 'ব্যাঙ্ক ও আড়তদারীর মধ্যে পার্থক্য,' 'যৌথ কারবারে

বাঙালী' প্রভৃতি অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। ব্যবসায়ে বিমুখ বাংলার যুবক-সমাজ এই পুস্তক হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া জাতির দৈন্য দূর করিতে যত্নবান হউন— ইহাই কামনা করি। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা,
তাং ১৯।৭।৩৮

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

নিবেদন

আমি সাহিত্যিক বা লেখক নহি। যশঃপ্রার্থী হইয়া আমি বই লিখিতে বসি নাই। সুতরাং 'মন্দ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্' —সে ভয় বা ভাবনা আমার মোটেই নাই। বই লেখা আমার পেশা নয়,—পেশা আমার ব্যবসায়-করা। তবু আমার বই লেখার খেয়াল চাপিল কেন?

একটু ইতিহাস আছে। 'অন্ন-সমস্যা', 'বেকার সমস্যা'—আজিকার দিনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বাঙালা-দেশে এ সমস্যা চরমে পৌছিয়াছে। স্কুল-কলেজের কৃতী ছাত্রেরাও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখেন! জাতির আশাস্থল যুবকদের মুখের পানে তাকাইলে তো ভরসা করিবার কিছুই থাকে না! মুখে হাসি নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, অন্তরে তেজ নাই—ছ্যাক্‌রা গাড়ীর আধমরা ঘোড়ার মত কোনমতে যেন তাহারা জীবনভার বহন করিয়া চলিয়াছে! মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, দুর্ব্বহ জীবনভার আর বহিতে না পারিয়া কেহ কেহ স্বেচ্ছায় জীবনের অবসান পর্য্যন্ত ঘটাইতেছেন। একটা জাতির পক্ষে ইহা পরম দুশ্চিন্তার কথা।

আচার্য্য পি, সি, রায় বাঙালীজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইয়া তাই "অন্ন-সমস্যায় বাঙালীর পরাজয়" নাম দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ভ আলোচনা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আজীবন ব্যবসায়ী হিসাবে এই অখ্যাতনামা গ্রন্থকারও এই সমস্যা নিয়া একটু মাথা ঘামাইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এ বিষয়ে আমার চিন্তার ফল ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধে দৈনিক বা মাসিকের পাতায়

প্রকাশ করিব। একটুখানি চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈনিক কাগজে রাশি রাশি বিজ্ঞাপনের স্থান দিয়া যে জায়গাটুকু বাঁচে, তাহাতে "রয়টার" "এসোসিয়েটেড্ প্রেস"—ইহাদের খবর ছাপিতেই কুলায় না। কাজেই সম্পাদক মহাশয়েরা বলেন,—"কাটিয়া ছাটিয়া একটু ছোট করিয়া দিন।" কিন্তু কাটিতে ছাটিতে গেলে অনেক কথাই অকথিত থাকিয়া যায়। যাক্, **'যুগান্তরে'** 'ব্যবসায়ে বাঙালীর পথ-নির্দ্দেশ' নামীয় আমার এই পুস্তকের প্রবন্ধটি একদিন প্রকাশিত হয়,—সংক্ষিপ্ত আকারেই অবশ্য। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সম্প্রদায় পাঠকের নিকট প্রবন্ধটি এত সমাদর লাভ করে যে, অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং বহু যুবক-বন্ধু পত্রালাপ দ্বারা আমার পরিকল্পনা আরও বিস্তৃতভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধেরই ফল এই পুস্তক—এই অনধিকার-চর্চ্চা!

আমার এ পুস্তক সাহিত্য নয়, সাহিত্যের সরসতাও ইহাতে নাই। আমি ব্যবসায়ী মানুষ—ব্যবসায়ের কথাই বলিয়াছি; উদ্দেশ্য—এই বেকার-সমস্যার দিনে যদি কেহ ইহা হইতে কোন নূতন আলোক বা সমাধান পান। কল্পনার জাল বুনিবার ইহাতে অবসরও নাই, কল্পনা-বিলাসীও আমি নই। সাদা চোখে সাদা জিনিষই আমি দেখিতে পাই—বলিয়াছিও আমি সাদা কথাই।

অনেকেই বাঙালীকে ব্যবসায় করিতে উপদেশ দেন দেখিতে পাই। কিন্তু এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে ব্যবসানভিজ্ঞ, মূলধনশূন্য সাধারণ বাঙালীর ছেলেরা কি ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিলে সাফল্য লাভ করিতে পারে, কোন চিন্তাশীল লেখক বা বক্তা তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকরী পন্থা দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বাঙালীরা ব্যবসায়ী নহে এবং বাংলাভাষায় ব্যবসা সম্বন্ধে কোন ভাল পুস্তক আছে বলিয়াও আমি জানি না। বাংলার অধিকাংশ ব্যবসাই

আজ ভিন্ন-প্রদেশীয় লোকেরা দখল করিয়া বসিয়া আছে। ঐ সমস্ত ধনী অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদিগের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া ব্যবসায় করিতে হইলে পশ্চাতে চাই একটি **শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান**। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া তাহারই কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বাঙালীকে ব্যবসামুখী করিবার জন্য আমি এ পুস্তকে কয়েকটি কার্য্যকরী "স্কিম" দিয়াছি এবং এই প্রসঙ্গে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছি। কিন্তু সমষ্টিগত চেষ্টা ছাড়া ব্যক্তিগত চেষ্টায় বা অর্থে কোন পরিকল্পনাই সফল হইবে না। বাংলার যে সকল মনীষী বা কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ বেকার-সমস্যা সমাধানে আগ্রহশীল, তাঁহারা যদি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও ঐকান্তিক চেষ্টা নিয়া অগ্রবর্ত্তী হন, আমার 'স্কিম্' (scheme) কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, এবং ইহার সফলতা সম্বন্ধেও আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।

বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, বিড়ালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ইঁদুরদের নাকি মন্ত্রণা-সভা বসে। তাহাতে স্থির হয়, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতে পারিলে আর ভাবনা নাই—বিড়াল আসিতে না আসিতেই ঘণ্টার শব্দে সচকিত হইয়া তাহারা পলাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু ঘণ্টা বাঁধিবারও কেহ জুটিল না, মন্ত্রণা-সভার প্রস্তাবও আর কার্য্যে পরিণত হইল না। এ ক্ষেত্রেও সেই কথা। যদি বাংলা দেশে উপযুক্ত কর্ম্মঠ লোক না জুটে, তাহা হইলে আমার পুস্তকে লিপিবদ্ধ যুক্তি-পরামর্শ কেবল পুস্তকেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

আমি নিজে বাঙালী। বাংলার মাটি, বাংলার জল শুধু আমার প্রিয় নয়,—ইহার সঙ্গে আমার নাড়ীর সম্পর্ক। বাংলার গৌরবে আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করি; বাংলার তরুণদের আমি শ্রদ্ধা করি,—ভালবাসি। তবু আমার এই পুস্তকে স্থানে স্থানে আমার স্বদেশীয়

ভ্রাতৃবৃন্দের দোষ-ত্রুটির কঠোর সমালোচনা করিয়াছি—তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছি,—কিন্তু ইহাও আমার ভালবাসার দাবীতেই করিয়াছি।

আমার জনৈক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি তো দেখিতেছি শুধু বাঙালীর দোষ-ত্রুটিগুলিই খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন; তাহাদের গুণের দিক্‌টা দেখেন নাই তো! আপনাকে একদেশদর্শিতার অপরাধে অপরাধী করা যায়।" আমি জবাব দিয়াছিলাম—"দেখুন, দোষ ত্রুটি দেখাইবার দাবী একমাত্র বন্ধুরই আছে। দরদ দিয়া যে ভালবাসে, দোষ-ত্রুটি সে-ই দেখাইতে পারে। আর গুণের কথা বলিতেছেন? গুণ কি কখনও চাপা থাকে?"

আমার এই পুস্তক পাঠে যদি স্বদেশবাসী আমার উপর বিরক্ত না হইয়া নিজেদের দোষ-ত্রুটি সংশোধনে জাতির কলঙ্ক ঘুচাইতে চেষ্টা করেন, আমার উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক হইবে।

ভারতের মধ্যে বোম্বেওয়ালারা লিমিটেড্ কোম্পানী ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাহারা বাঙালীর ন্যায় শিক্ষিত না হইলেও, জনসাধারণের টাকায় কি ভাবে ব্যবসায় করিতে হয়, তাহা তাহারা বেশ বুঝে।

ইউরোপবাসীরা লিমিটেড্ কোম্পানী-গঠনে ব্যবসায় করে। অতিরিক্ত মূলধনের জন্য তাহাদের ব্যবসা শক্তিশালী হয়। বাঙালীরা তাহা পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্বার্থপরতায় কিংবা অনভিজ্ঞতায় উহা নষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে বাঙালী-পরিচালিত কোম্পানীর প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে। আর সেইজন্যই তাহারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এত হীন হইয়া আছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যবসায়ে আজ বাঙালী যত অনভিজ্ঞ ও যত পশ্চাতেই থাকুক না কেন এবং তাহাদের মূলধন যত সামান্যই হউক না কেন, যদি তাহারা স্বার্থপরতা, প্রতারণা, আত্ম-প্রাধান্য ও পাণ্ডিত্য-

মনোবৃত্তি পরিহার করিতে পারে, তাহা হইলে শুধু ব্যবসায়-ক্ষেত্রেই নয়, অদূর-ভবিষ্যতে সকল প্রতিষ্ঠানেই তাহারা আদর্শ সৃষ্টি করিয়া তুলিবে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমি স্থানে স্থানে বাঙালীর শিক্ষা ও সামাজিক জীবনযাত্রার বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি, কারণ খাঁটী ব্যবসায়ী হইতে হইলে বাঙালীকে শুধু বাহিরের ত্রুটি নয়, ভিতরের ত্রুটিগুলিরও সংশোধন করিতে হইবে।

ব্যবসা সম্বন্ধে লিখিবার আছে যথেষ্ট। সব লিখিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বাড়িয়া যায়, মূল্যও বৃদ্ধি করিতে হয়। তাই যথাসাধ্য সংক্ষেপেই আমি আলোচনা করিয়াছি, এমন কি, অনেক কথা মোটে বলাই হয় নাই। তারপর আমি কর্ম্মব্যস্ত মানুষ, আমাকে কতিপয় ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, কাজেই আমার হাতে সময়ের পুঁজি কম। আমি বড় বড় গ্রন্থ বা নানাবিধ কমিশনের রিপোর্ট পাঠে এই পুস্তকে কোন নূতন তথ্যে আলোক-সম্পাত করি নাই—সে ক্ষমতারও আমার অভাব। বাংলায় বেকারের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক বেকার আমার নিকট চাকুরীর অন্বেষণে আসিত, এবং এখনও আসে। ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেককেই সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। তা'হলেও এ সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আমি ভাবিতাম, এবং যাহা মনে হইত, তাহা আমি একখানি নোটবুকে লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু উহা পরিপাটী (fair) করিয়া লিখিবার মত সময় আমার ছিল না। আমার স্বগ্রামবাসী শ্রীমান সুধীর কৃষ্ণ রায় ও সুনীতি রঞ্জন মুখোপাধ্যায় উভয়ে আমার প্রবন্ধগুলি নকল করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য না করিলে হয়তো ইহা কোন দিন পুস্তকাকারে প্রকাশিতই হইত না।

আমার বক্তব্য সাজাইয়া গুছাইয়া আমি বলিতে পারি নাই,—একথা আমি ভাল করিয়াই জানি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য-চর্চ্চা আমার

পেশা নয়, ব্যবসা-চর্চ্চাই আমার পেশা। অথচ বলার মত বলিতে না পারিলে বই হয় না। আমার শত ত্রুটির জন্য তাই আমি পাঠকদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। তাঁহারা যেন আমার লেখার মুন্সিয়ানার বিচার না করিয়া যে-সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আমি একাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই বিচার করেন।

এই সম্পর্কে আমি অন্নদা প্রেসের পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করিয়া পারিতেছি না। আমার পুস্তকখানি মুদ্রণের প্রারম্ভে তিনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস (এক সময়ে 'Advance' পত্রিকার সহিত সম্পর্কিত) মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া না দিতেন, হয়তো এত সত্বর এ পুস্তক প্রকাশের সুযোগ আমার ঘটিত না। সাংবাদিক-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন এই তরুণ বন্ধুটি অকুণ্ঠিত-চিত্তে আমার এ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি (manuscript) সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে নূতন নূতন বিষয় অবতারণা করিবার প্রস্তাব (suggestion) দান করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়েরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আর একটি কথা—**আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়** আনন্দের সহিত আমার এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা মুখবন্ধ নয়, আমার 'পরে ইহা তাঁহার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ। ইতি—

খালিসখালী,
খুলনা।
১লা শ্রাবণ, ১৩৪৫ সাল

বিনীত
গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

ব্যবসায়ে বাঙালী

ব্যবসায়ে বাঙালী পশ্চাতে কেন ?

ভারতের অন্যান্য জাতির তুলনায় বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভায় বাঙালী যে পরিমাণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, ব্যবসাক্ষেত্রে তেমনি এই জাতি সকলের পশ্চাতে পড়িয়া অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইহার কারণ কি ? বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভায় যে জাতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, সে জাতি ব্যবসায়-বুদ্ধিতে এত নিস্তেজ হইল কেন ? "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—ব্যবসা-বাণিজ্য ভিন্ন কখনও কোন জাতির শ্রীবৃদ্ধি হয় না। জগতে যে জাতি যত ধনী হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, সে জাতি তত ব্যবসায়-বুদ্ধিশালী।

আমাদের এই বাংলাদেশে ব্যবসায় করিয়া হাজার হাজার অ-বাঙালী কোটীপতি হইয়াছে ; অথচ নিজের দেশে বাঙালী আজ উদরান্নের জন্য 'হায় হায়' করিতেছে ! ইহা কি একটা জাতির পক্ষে কম লজ্জার কথা ? আর সে সামান্য জাতি নয়—এমন এক জাতি, যে জাতির ইতিহাস আছে—সংস্কৃতি আছে—চিন্তার মৌলিকত্ব আছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালীর অপরাজেয় অবদান কে অস্বীকার করিতে পারে ? এই বাংলায়ই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। মুমূর্ষু জাতির প্রাণে নব চেতনা সঞ্চার করিয়া সে আন্দোলনের যখন সূত্রপাত হইল, ভারতের আর আর জাতি তখন ঘুমাইয়া আছে—রাজনীতিক্ষেত্রে তাহারা তখন শিশু। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ যে স্বরাজের দাবী জানাইতেছে,

বাংলার নেতা স্থরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার মন্ত্রদাতা। মনস্বী গোখেল সেদিন বলিয়াছিলেন—"What Bengal thinks to-day, the whole of India will think to-morrow"—'বাংলা আজ যাহা চিন্তা করিতেছে, সমগ্র ভারত একদিন তাহা চিন্তা করিবে।' এই বাংলার কোলেই জন্ম ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের—এই বাংলারই মুখ উজ্জল করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রাসায়নিক প্রফুল্ল চন্দ্র, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—এই বাংলাদেশেরই সন্তান।

যে দেশ এতসব প্রতিভার জন্ম দিয়াছে, প্রশ্ন জাগে, সেদেশে আজ এত হাহাকার কেন? বাংলার বহু বহু কৃতী সন্তানকে দেখিতে পাই, উদরান্ন-সংস্থানের জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। যুবক-সম্প্রদায়ের মুখে তো তাকানোই যায় না! এই যে অবস্থা, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? এই যে পরাজয়ের গ্লানি আজ বাঙালীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহার জন্য দায়ী কে? ইহার কি কোন সমাধান নাই? এই প্রশ্নটারই জবাব দিতে চেষ্টা করিব।

বাংলার ধনি-সম্প্রদায়

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে বাংলার ধনি-সম্প্রদায়ের কথা। তাঁহারা যদি এ ব্যাপারে অগ্রণী হইতেন, দেশের এ দুর্দ্দশা আজ হয়তো চরম-সীমায় পৌঁছিত না। নিশ্চিন্ত আরাম-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যদি ব্যবসা-ক্ষেত্রে নামিয়া আসিতেন, তাহাতে যে কেবল বেকার-সমস্যারই সমাধান হইত, তা নয়, তাহাদের নিজেদেরও অর্থাগম হইত প্রচুর। কিন্তু এ জাতীয় ঝুঁকি লইতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন—কি জানি, যদি টাকাটা মারা যায়! তার চেয়ে নিরাপদে কোম্পানীর কাগজের সুদ গুণিয়া যাওয়া ঢের ভাল। এই তো তাঁহাদের মনোবৃত্তি!

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে যে উন্নতি ও সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙালী জাতির পক্ষে একটা গৌরবময় দৃষ্টান্ত। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। এই প্রতিষ্ঠানের যশ আজ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বাঙালী মাত্রেই ইহার গৌরবে গৌরবান্বিত। বেঙ্গল কেমিক্যালের জিনিষের চাহিদা এখন ভারতের সর্ব্বত্র। ইহার দ্বারা দেশের বেকার সমস্যার যে আংশিক সমাধান হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই বেঙ্গল কেমিক্যালের সুনাম ও ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া, অ-বাঙালীর দল ইহার শেয়ার খরিদ করিয়া, প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিল। কতক 'শেয়ার' আজ অ-বাঙালীর হাতে। বাংলা দেশের ধনি-সম্প্রদায় কোন অনিশ্চিত ব্যবসার ঝঞ্ঝাটে না গিয়াও বাংলার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারগুলি কিনিয়া রাখিতে পারিতেন। তাহাতে বাংলার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যেমন যথেষ্ট সাহায্য হইত, তেমনি হিসাব করিলে দেখিতে পাইতেন, পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত কোম্পানির কাগজের দ্বারা যে সুদ আসে, এই জাতীয় উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হইতে লব্ধ 'ডিভিডেণ্ড' (Dividend) সে সুদের হার অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না। আবার দেখিতে পাই, গরীবের ছেলেরা যেমন উদরান্ন সংগ্রহের ধাঁধায় চাকুরীর জন্য ছুটাছুটি করিতেছে, অনেক ধনি-সন্তানও তেমনি বিদেশী কোম্পানির আফিসে টাকা জমা রাখিয়া চাকুরীর উচ্ছিষ্টের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেছেন। যদি এই সমস্ত ধনি-সন্তান চাকুরীর দিকে না ঝুঁকিয়া এই সমস্ত টাকাকে মূলধন করিয়া কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন, তাহাতে একদিকে নিজেরাও যেমন লাভবান হইতে পারিতেন, অন্যদিকে দশজন গরিব বেকারও প্রতিপালিত হইত। বস্তুতঃ চাকুরী করাটা যেন বাঙালীর মজ্জাগত

অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চাকুরীই বা কোথায়? চাকুরী পাওয়ার অতীতে যে সুযোগ-সুবিধা ছিল, বর্ত্তমানে আর তাহা আছে কি?

ব্যবসায়ে কি চাই

অবশ্য ব্যবসায় করিতে গেলে অনেকটা ঝঞ্ঝাট ও দুশ্চিন্তা আছে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-পরায়ণ ও কষ্টসহিষ্ণু না হইলে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ শক্ত। চাকুরী করিবার ফলে বাঙালী ঐ আত্মশক্তিটিতে বিশ্বাস হারাইয়াছে। ঝঞ্ঝাট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে যাইতেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! ব্যবসা করিয়া লাভ হইবে, কি লোকসান হইবে, এই চিন্তাই বাংলার নন্দদুলালদের কাবু করিয়া ফেলে। কিন্তু এই কথাটা একবারও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, কোন প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া কাজ না করা পর্য্যন্ত কখনই দায়িত্ব-জ্ঞান জন্মে না। সাঁতার না শিখিয়া জলে নামিব না, আর কাজে ওস্তাদ না হইয়া কাজ করিব না, দুই এক কথা। এ' দু'টি কথাই অর্থহীন। সাঁতার শিখিতে হইলে যেমন দুই একবার ডুবিতে হয়, ব্যবসায় করিতে বসিয়াও তেমনি অনভিজ্ঞতার জন্য এক আধবার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু এই ক্ষতিটুকুকে আশ্রয় করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহার মূল্য অতুলনীয়। একটা ব্যক্তিগত উদাহরণ দিই।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

ব্যবসায় শিক্ষার জন্য আমি প্রথম জীবনে মাত্র দশ টাকা মাহিনায় চাকুরী আরম্ভ করি। পরে জনৈক অংশীদার সংগ্রহ করিয়া নিজে ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিলাম। প্রথম বৎসরে লোকসান হয় অনেক টাকা। মূলধনে আমার নিজের একটি পয়সাও ছিল না। লোকসান হওয়ায় আমার মূলধনের অংশীদারতো দমিয়া গেলেন—এমন কি, তিনি ব্যবসা ছাড়িয়া দেওয়ারই সঙ্কল্প করেন। আমি অনেক প্রকারে

বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করি। পর বৎসর যাহা লাভ হইল তাহাতে লোকসানতো পূরণ হইয়া গেলই, তাহার উপরে আরও চারি হাজার টাকা লাভ হয়। তখন আমার অংশীদারের উৎসাহের আর অবধি নাই—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আরও মূলধন প্রদান করিলেন। অনভিজ্ঞতার জন্য যদি কোন কাজে প্রথমাবস্থায় লোকসানই দিতে হয়, তবে হাল ছাড়িয়া দিতে নাই। লোকসান দিয়া যে অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় হইল, ভাবী সফলতার পক্ষে এটি পরম সম্পদ্ হইয়া রহিল। ঐ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইয়া ভবিষ্যতে উক্ত ব্যবসায়ে উন্নতি করা অসম্ভব নহে। চাই নিজের একটা আন্তরিক জিদ্। ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া হাত-পা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন "প্রথমেই যদি লোকসান দিই আর তাহাতে মূলধন নষ্ট হইয়া যায়, তবে আবার কি লইয়া পুনরায় কারবার চালাইব?" উত্তর—ব্যবসায়ে লোকসান হইলে, কেন এই লোকসান হইল, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে অবস্থার উন্নতি করা যাইবে,—লোকসানের ফলে যদি এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তবে সে ব্যবসায়ী তখন হয় ধার করিয়া কিংবা ধনী অংশীদার সংগ্রহ করিয়া উক্ত ব্যবসা পুনরায় চালাইতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু ব্যবসায়ীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরিশ্রমী হইতে হইবে।

অ-বাঙালী ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়

সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও বড়বাজারে অ-বাঙালীদের অট্টালিকার দিকে একবার চাহিয়া দেখুন—বাংলাদেশ যেন বিকানীরের রাজধানী! আমড়াতলার গুজরাটী, কাচ্ছি মুসলমান ব্যবসায়ীদিগের এক একজনের ৪।৫ কোটী টাকা মূলধনের কথা শুনিলে মনে হয় বুঝি রূপকথার কাহিনী! এই যে টাকা—অঙ্ক পাতিলে যাহা শিলেটের দৈর্ঘ্য ছাড়াইয়া যায়—এই বাংলাদেশে ব্যবসায় করিয়াই, ইহারা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এখানে আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যবসায়ে যদিও বা দুই একজন বাঙালী থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত মুসলমান-সম্প্রদায় যে ব্যবসায় করে, তাহার ছন্নাংশে কোন বাঙালী ব্যবসায়ীর স্থান নাই, এমন কি, বাংলাদেশের কোন মুসলমানেরও স্থান নাই। এই সমস্ত গুজরাটী কাচ্ছি মুসলমান-ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ হইতে অগাধ টাকা রোজগার করিতেছে, কিন্তু বাঙালীদের পকেটে তাহারা একটি পয়সা দিবে না। বরং নিজেদের দেশ হইতে হিন্দু কর্ম্মচারী আনাইয়া বাংলাদেশে রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করিবে, তবুও বাংলাদেশের হিন্দু তো দূরের কথা, একজন মুসলমানের উপরও এই ব্যবসায়ীরা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাইবে না। ইহাতেই বুঝা যায়, এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা জাতি-প্রীতি অপেক্ষা দেশ-প্রীতিকেই উপরে স্থান দেন। আমাদের বাংলার মুসলমান ভ্রাতাগণকে এখানে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারা নিয়া তো তাঁহারা খুব লড়িতেছেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতীয় অ-বাঙালী মুসলমানগণের মনোভাবের কোন সংবাদ রাখেন কি? তাঁহারা শুনুন, এই সমস্ত ব্যবসায়ী বাংলাদেশের খরিদ্দারের নিকট মাল বিক্রয় করিয়া তাঁহাদেরই কাছ হইতে ৵বৃত্তি নামে যে টাকাটা আদায় করিয়া রাখেন, তাহাতে সেই ফাণ্ডে নাকি ৪০ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। কিন্তু বাংলার বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের দিনে যে-সব মুসলমান (হিন্দুদের কথাটা নাই বলিলাম) আজ ঘর ছাড়িয়া কলিকাতার রাজপথে ও খালধারে না খাইয়া ঘুরিতেছে, তাহাদের দুর্দ্দশা-মোচনে ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীরা উক্ত তহবিল হইতে এক কপর্দ্দকও দান করিয়াছেন কি? * অথচ এই সমস্ত দুর্গত লোকের রক্তশোষণ করিয়াই না আজ তাঁহারা

* ১৯৩৬ সালের কথা।

এক একজন কোটীপতি! আচার্য্য পি, সি, রায় ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই অ-বাঙালীদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথাটি বলিতে তাঁহার দ্বিধা নাই। যে দেশের রক্ত শোষণ করিয়া আজ এই সকল ব্যবসায়ীরা টাকার উপরে গড়াগড়ি যায়, সেই দেশের লোকের প্রতিই তাঁহাদের এই নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? ইংরাজ-জাতির বিরুদ্ধে আমাদের যত নালিশই থাক্, এ কথাতো অস্বীকার করিতে পারি না, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবসার মধ্যে বহু বাঙালীকে চাকুরী দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন।

ব্যবসায়ে প্রাদেশিকতা

ভারতেবই এক প্রদেশবাসী লোকের যখন অন্য প্রদেশবাসী লোকের প্রতি সহানুভূতি নাই, তখন সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের ইংরাজ-জাতির কথা তুলিয়া, তাহাদেব উপর অভিশম্পাত করিয়া লাভ কি? ভারতের এই সমস্ত ব্যবসায়ীর সহিত তুলনা করিলে বরং ইংরাজ-জাতিকে অনেক উচ্চে স্থান দিতে হয়। বর্ত্তমানে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে সরকারী চাকুরীতে 'ডমিসাইল' (Domicile) প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা উদার—বিহার বিহারীদের, উড়িষ্যা উড়িয়াদের, আসাম আসামীদের—কিন্তু **বাংলা সকলের**। এমন বেপরোয়া লুঠের মহাল দুনিয়ায় আর কোথায়ও নাই। এতো গেল চাকুরীর ব্যাপারে—কারবারের বেলায়ও তাই। আমি বিহার প্রদেশে কয়েকটি বাঙালীর কারবার দেখিয়াছি। লক্ষ্য করিয়াছি, তথাকার অধিবাসীরা বাঙালীর দোকান হইতে কোন জিনিস ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক। অন্ততঃ বেহারী একজন কর্ম্মচারী বাঙালীর কারবারে না থাকিলে কারবার পরিচালনা করাই

অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙালী বাবুদের ধাৎ আলাদা। দেখিয়াছি বাংলার বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যখন বাঙালীবাবুরা বায়ু-পরিবর্ত্তনে যান, বাঙালীর দোকান থাকা সত্ত্বেও সেখান হইতে জিনিষ ক্রয় না করিয়া অনেকে ঐ প্রদেশের লোকের দোকান হইতেই নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন। সব প্রদেশের লোকেরই আপন আপন প্রদেশবাসীর প্রতি যে সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়, একমাত্র বাঙালী জাতির মধ্যেই তাহার অভাব দেখিতে পাই।

প্রথম হইতেই বাঙালী জাতি যদি ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিত এবং পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিতে আগ্রহশীল হইত, তবে বাঙালীর প্রতিভা আজ ব্যবসাক্ষেত্রেও চরম উৎকর্ষ লাভ করিত। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্তই আজ বাঙালী করিতেছে—সেই ভুলের ফসল কুড়াইতে কুড়াইতেই ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী আজ এই শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ব্যবসাক্ষেত্রে আজ সে সকলের পশ্চাতে।

ব্যবসায়ে বাঙালীর দুর্গতির কারণ

বাঙালী সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী হইলেও ব্যবসাক্ষেত্রে তাহার স্থান সর্ব্বনিম্নে। এইজন্য বাংলার 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'কে কতকটা দায়ী করা যায়। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ফলে পল্লী-অঞ্চলের লোকের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কোন ভাবনা ছিল না। বিলাস-আড়ম্বর সুদূর পল্লীতে তখনও এতটা প্রবেশলাভ করে নাই, সুতরাং কাল্পনিক অভাব-অভিযোগের ফর্দ্দও ছিল তখন ছোট। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, স্বচ্ছন্দবনজাত তরি-তরকারী,— তখনকার দিনে বাঙালীর সহজ সরল জীবনযাত্রার পক্ষে ঐ ছিল যথেষ্ট। অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা না থাকিলে মানুষ স্বভাবতঃই আরামপ্রিয় ও অলস হইয়া পড়ে, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ফলে বাংলার গ্রামবাসিগণও ঠিক তাই হইয়া পড়িয়াছিল।

চাকুরীর মোহ

এমন এক সময় ছিল যখন পল্লী-অঞ্চলের লোক কলিকাতার সংবাদ পর্য্যন্ত রাখিত না। পরে রামমোহন রায়, হেয়ার সাহেব প্রভৃতি মনীষিগণ কর্ত্তৃক 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হওয়ার ফলে এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হইল এবং তখন হইতে লোকের ইংরাজি শিক্ষা করিয়া চাকুরীতে ঢুকিয়া পড়িবার দিকে ঝোঁক বাড়িয়া গেল। রাজ্য শাসনের জন্য সে সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি এদেশীয় কেরাণীর দরকার হইয়া পড়ে। এক এক করিয়া যত নূতন নূতন প্রদেশ ইংরাজের আয়ত্তাধীনে আসিতে আরম্ভ হইল, ততই ইংরাজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর আদর বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য

প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাই প্রথমতঃ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সরকারী আফিসে চাকুরী লাভ করে। ইংরাজ রাজ্য-শাসনের ভার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-বণিকগণ বাংলায় সওদাগরী আফিস স্থাপন করেন। অল্প-বিস্তর ইংরাজি শিক্ষা করিয়াই বাঙালী এই সব আফিসের কেরাণীগিরি লাভ করিতে লাগিল। চাকুরীর মোহে পড়িয়া বাঙালী ব্যবসা ও কৃষিকে নীচ কাজ বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল।

অদূরদর্শী বাঙালী

এই সময়ে ইংরাজ-বণিকগণের ব্যবসার সুবিধার জন্য এদেশীয় কতকগুলি এজেণ্টের দরকার হইয়া পড়ে। কারণ এদেশের সর্ব্বত্র মাল বিক্রয় করিতে হইলে এদেশীয় দালাল ভিন্ন সুবিধা হয় না। বাঙালীরা ব্যবসায়ে আগ্রহ প্রকাশ না করায়, কতকগুলি হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া ইংরাজ-বণিকগণ ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করে। ক্রমে ইংরাজ-বণিকদের সহিত ব্যবসা চালাইয়া হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীরা মোটা হইতে লাগিল। এদিকে বাঙালী বাবুরা বাঁধা মাহিনার কেরাণীগিরিতে দাসখত লিখিয়া দিয়া আপন ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া চলিলেন। তারপর হইল রেলপথ নির্ম্মাণ—যাহার ফলে দূর আর দূর রহিল না। সঙ্গে সঙ্গেই গুজরাটী, ভাটিয়া, কচ্ছী প্রভৃতি বাংলায় আসিয়া আসন গাড়িয়া বসিয়া নানাপ্রকার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিল। সেদিনও বাঙালীর চৈতন্য হয় নাই। তখনও অদূরদর্শী বাঙালীর চোখে ভবিষ্যতের ভীষণ চিত্রটি ধরা পড়িল না। মোহাচ্ছন্ন বাঙালী তখনও ব্যবসাকে মর্য্যাদার আসন দিতে পারিল না, ব্যবসা যে 'ছোটলোকের কাজ', এ ধারণাই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া

রহিল। আর সত্য সত্যও তখনকার দিনে উচ্চবর্ণের কোন লোক ব্যবসা করিলে সমাজ তাহাকে অবহেলার চক্ষে দেখিত। তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও অনেকে লজ্জাবোধ করিতেন। ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং দেশে আধুনিক সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হওয়ার দরুণ সাধারণ লোকের মধ্যে নিত্য-নূতন অভাব-অভিযোগ দেখা দিতে লাগিল এবং ক্রমে চাকুরী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। কাজেই উদরান্ন-সংস্থানের উপায়ান্তর না দেখিয়া লোকে ব্যবসার দিকে অনুরাগী হইয়া পড়িল। কিন্তু ব্যবসার দ্বার তখন রুদ্ধ।

ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা

বাংলার বাহির হইতে অগণিত অ-বাঙালীর দল আসিয়া বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই দখল করিয়া বসিয়াছে। আর ব্যাপার এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, এখন কোন বাঙালী যদি ব্যবসাক্ষেত্রে তাহাদেব সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহারা এরূপভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে যে, বাঙালী কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। ইহারা দশজন ব্যবসায়ী যদি জোট হইয়া একজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দেয়, তবে সে ব্যবসায়ী এই সমবেত প্রতিযোগিতার মুখে কতক্ষণ টিকিতে পারে? প্রথমতঃ ইহারা এদেশীয় নূতন ব্যবসায়ীকে কোথায়ও সুবিধা দরে মাল কিনিতে দিবে না। টাকার জোরে যদি বা কেহ নগদ টাকায় মাল খরিদ করিতে সক্ষমও হয়, তখন ঐ সমস্ত অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা হয়তো সঙ্ঘবদ্ধভাবে বলিয়া বসিবে—উক্ত নূতন ব্যবসায়ীর নিকট যে-লোক মাল বিক্রয় করিবে, তাহার নিকট হইতে আমরা কেহই মাল খরিদ করিব না। একটি খরিদ্দারের ভরসা করিয়া দশজন মহাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কে সাহস করিবে? কাহার এত বড় বুকের পাটা?

দ্বিতীয়তঃ, বাজারে ঐ সমস্ত মাল বিক্রয়ের সময়ে তাহারা দালাল বন্ধ করিয়া দিবে। যদি নূতন দালাল লইয়াও মাল বিক্রয়ের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলেও ঐ সমস্ত সঙ্ঘবদ্ধ অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা এমনভাবে মালের দাম কমাইয়া বিক্রয় সুরু করিয়া দিবে যাহাতে এদেশের নামজাদা বড় ধনী ব্যক্তিও উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না। অন্যান্য ব্যবসার মধ্যে যদিও বা একটু-আধটু ফাঁক আছে, কিন্তু আমড়াতলার গুজরাটী, কচ্ছি মুসলমানের মশলা, নারিকেল তৈল, বাদাম তৈল প্রভৃতি ব্যবসার মধ্যে সূচ ফুটাইবার ফাঁকটিও নাই। একমাত্র উপায়, যদি বাঙালীরা কোনদিন সঙ্ঘবদ্ধভাবে একযোগে উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় এবং ঐ সমস্ত মালের খরিদ্দার, ব্যবসায়ীরাও যদি বাঙালী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হয়। একমাত্র তাহা হইলেই সফলতা লাভ হয়তো অসম্ভব নয়। নচেৎ উক্ত ব্যবসায়ে যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে তাহারই ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ত্তমানে মাড়োয়ারীরা কেহ কেহ উক্ত ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছে।

বর্ত্তমান ব্যবসার বাজার

বাংলায় যাহা কিছু ব্যবসা করিবার ছিল, আজ তাহার সমস্তই অ-বাঙালীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে ঝুঁকিয়া পড়িত, জীবন-সংগ্রামে বাঙালী আজ পরাস্ত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে পাইত না। যে বাঙালী এতদিন ব্যবসাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ তাঁহার সন্তান-সন্ততি, এমন কি, ব্রাহ্মণ-সন্তানও অন্নবস্ত্রের সংস্থানে জুতার দোকান, ধোপার দোকান, নাপিতের দোকান, চায়ের দোকান খুলিয়া বসিতেছে। কারণ সামান্য মূলধনে এই সমস্ত নিম্নস্তরের ব্যবসায় ভিন্ন আর কিছু

চলিতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবসায় দ্বারাও কি কেহ উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে? কলিকাতার ঘরভাড়া, লাইসেন্স, ট্যাক্স, হোটেলের খোরাকী ইত্যাদিতে খুব কম পক্ষে মাসিক ৩৫৲ টাকা আয় না হইলে এরূপ একটি ব্যবসার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। এই ব্যয়-সঙ্কুলানের পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবেই তো লাভ। কিন্তু একটু খবর লইলেই জানা যাইবে যে, এক পল্লীতে ২।৪টি দোকান ছাড়া অধিকাংশ দোকানেরই মাসিক আয় হইতে ব্যয়-সঙ্কুলান হয় না, কাজেই অল্পকালের মধ্যেই দোকানদারেরা তাহাদের কষ্ট-সঞ্চিত মূলধন হারাইয়া কারবার গুটাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এদিকে কলিকাতার বাড়ীওয়ালার কিন্তু ঘর খালি পড়িয়া থাকে না। আজ যে-ঘরে ধোপার দোকান দেখিতেছি, দু' মাস পরেই সেই ঘরে নাপিতের দোকান দেখিতে পাই। আবার কিছুদিন পরে দেখিতে পাই, সেই ঘরেই হারমোনিয়ম মেরামত হইতেছে। এক বৎসরের মধ্যে একই ঘরে অন্ততঃ পক্ষে ৩।৪ রকমের কারবার চলিতে দেখা যায়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলার যুবক-সম্প্রদায় কোন কাজেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

পাটের দর

৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে পাটের চাষ ছিল বাংলার একটা প্রচুর আয়ের ব্যাপার। যতদিন পাটের দর ছিল, ততদিন জমিদার, চাষী, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যে অর্থ-কষ্ট এত প্রবল আকার ধারণ করে নাই। কারণ দেশের মধ্যে অর্থাগম হইলে, তাহা ঠিক একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে না। নানা উপায়ে উহা সকল শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের চাষীরা হাতে টাকা পাইলে, তাহা কোন প্রকারেই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে জানে না। পাটের মণ যে বৎসর

২৫।৩০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল, সে বৎসর কলিকাতায় করগেট টিন্, শালের খুঁটী, লোহার সিন্দুক, সাইকেল প্রভৃতি জিনিষ যে কি অসম্ভব পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। সে বৎসর ফৌজদারী আদালতে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাও অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চাষীর অর্থ নানা ভাবে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতে সাধারণ লোকের অর্থ-কষ্ট চরম অবস্থায় উঠে না, অন্ততঃ অনাহারে মৃত্যু ঘটে না।

অর্থাভাব

বাংলা কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিলব্ধ জিনিষের যদি উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাইত, তাহা হইলে হয়তো সাধারণ লোকে অন্নবস্ত্রের অভাবে আজ দুর্দ্দশার এতটা চরম সীমায় উপস্থিত হইত না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার অনাবৃষ্টির ফলে ফসল অজন্মা হেতু চাউলের দর প্রতি সের তিন আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু পাট বা কৃষিলব্ধ অন্যান্য জিনিষের দর বেশী থাকায় সাধারণ লোক আলোচ্য ১৯৩৬ সালের মত এত বিপন্ন হইয়া পড়ে নাই। গত বৎসর ধান্যের ফসল অজন্মা হেতু এ বৎসর রেঙ্গুন হইতে বাংলাদেশে ৯৩ লক্ষ বস্তা চাউল আমদানী হইয়াছে। বাজারে চাউল পাঁচ পয়সা সের খুচরা বিক্রয় হইতেছে, তাহাতেও সাধারণ লোক অনাহারে-অর্দ্ধাহারে কাটাইতেছে। ইহা প্রমাণ করে, বাংলাদেশে কি শোচনীয় অর্থাভাব ঘটিয়াছে! কৃষিলব্ধ জিনিষের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায়, কৃষক-শ্রেণীর ত সর্ব্বনাশ হইয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার জমিদার, তালুকদার, গাঁতীদার প্রভৃতির সম্পত্তিও প্রতি কিস্তিতে নীলামে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। ব্যবসার মধ্যেও ঘোর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে। একমাত্র জন-কয়েক মুষ্টিমেয় ধনী লোকের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাংলার সাধারণ লোক সকলের মধ্যেই প্রায় হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

আলোক না অন্ধকার ?

আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র দাস বি, এল, মহাশয় তাঁহার "বাঙালী ব্যবসায়ে পশ্চাৎপদ কেন" প্রবন্ধে অন্যান্য যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিতেছেন, "আবার বাঙালী ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়াছে। দূর কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী ব্যবসায়ে চরম উৎকর্ষ করিয়া ছাড়িবে। যে বাংলার রাজধানী কলিকাতায় আজ মাত্র শতকরা ৬ জন বাঙালী ব্যবসায়ী, কালক্রমে সেইস্থলে ৯৪ জন বাঙালী ব্যবসায়ী দেখা দিবে। ব্যবসাক্ষেত্রে মাড়োয়ারী প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশীদের প্রভুত্ব চলিয়া গিয়া বাঙালীর প্রভুত্ব পুনঃ সংস্থাপিত হইবে।" (১৯৩৬ সাল)

বিজয়বাবুর উল্লিখিত কথা হয় তো একদিন সত্যে পরিণত হইতেও পারে। তিনি হয় তো এ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হউক আমরা সেই কামনাই করি। কিন্তু বাঙালী ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিতে গিয়া বর্ত্তমানে যে পথটি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহা ঠিক পথ বলিয়া মনে হয় না। একই ব্যবসায়ে যদি সমস্ত লোক আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সকলেই যে তাহাতে উন্নতি লাভ করিবে, ইহা আশা করা বৃথা। ওকালতী ব্যবসার মধ্যে হাজার হাজার লোক প্রবেশ করিয়াছে, সকলেরই অন্ন জুটিতেছে বলা চলে কি ? কাজেই বিজয়বাবু বাঙালীকে ব্যবসামুখী হইতে দেখিয়া, বাঙালীর অনাগত ভবিষ্যৎকে সমুজ্জ্বল কল্পনা করিয়া যে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন, আমি কিন্তু ঐ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙালীর ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারময় ছাড়া আলোকোজ্জ্বল কল্পনা করা যায় না। বাঙালী উদরান্ন-সংস্থানের

জন্য চাকুরীর আশায় হতাশ হইয়া ব্যবসার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে ইহা ভাল কথা, কিন্তু ইহার নাম কি ব্যবসা!

গতানুগতিক পন্থা

কোন প্রকারে পঞ্চাশ হইতে একশত টাকা পুঁজি সংগ্রহ করিয়া বেকার-সম্প্রদায়,—যেখানে পূর্ব্ব হইতেই পাঁচখানি চায়ের দোকান আছে, তারই মধ্যে হয় তো আরও পাঁচখানি চায়ের দোকান খুলিয়া বসিলেন। কিম্বা ডাইং ক্লিনিং, হেয়ার কাটিং সেলুন প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। তাহাতে কি লাভ হইল? হয় তো ঐ সকল ব্যবসায়ে পাঁচজনের কোন প্রকারে উদরান্নের সংস্থান হইতেছিল, ইহার উপর আরও পাঁচজন সেই একই ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ানোর ফলে কাহারোই আর লোকসান ছাড়া লাভ হইল না। কারণ একই পল্লীর নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক গ্রাহক,—যাহা পাঁচজন ব্যবসায়ীর মধ্যে ভাগাভাগি হইত, তাহা দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া যাইতেছে। এ জাতীয় ব্যবসায়ের খরিদ্দার মফঃস্বল হইতে আমদানী হয় না। ভবানীপুরের লোক শ্যামবাজারে চা খাইতে, কাপড় কাচাইতে বা চুল ছাঁটাইতে যায় না। বস্তুতঃ প্রত্যেক রাস্তায়, প্রত্যেক মোড়ে এই জাতীয় ব্যবসায় এত বেশী গজাইয়া উঠিতেছে যে, কোন পল্লীর লোকের ঐ জন্য একশত গজও দূরে যাওয়ার আবশ্যক হয় না।

যাহারা একটু বেশী মূলধন লইয়া ব্যবসা করিতেছে, তাহারা কেবল জামা কাপড়ের দোকানের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিতেছে। সস্তা দামের বিজ্ঞাপনের ঠেলায় তো রাস্তায় চলা দুঃসাধ্য! পথে বাহির হইলে অন্ততঃ ১০।১৫ খানি বিজ্ঞাপন হাতে করিয়া ঘরে ফিরিতে হয়। এই প্রকার দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুবিধা হইয়াছে খরিদ্দারগণের। বাস বা ট্রামে ভাড়া দিয়া দূরে গিয়া

আর কোথাও কিছু কিনিতে হয় না। এক দোকানের গ্রাহক এখন পঞ্চাশ দোকানে জিনিস কিনিতেছে, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতার ফলে জিনিসের মূল্য একেবারেই সস্তা হইয়া গিয়াছে। কাজেই কোন ব্যবসায়ী যে এই প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া বড় একটা লাভ করিতে পারিতেছে, এ ধারণা ভুল। একই জিনিসের অসংখ্য দোকান হইলে তাহাতে কাহারও কিছুই লাভ হয় না, লাভ হইতেছে কেবল ধনী বাড়ীওয়ালাদের। তাঁহারা এই সমস্ত ব্যবসায়ীর নিকট ঘরভাড়া দিয়া প্রথম দফায় একটা সেলামী আদায় করেন। তারপর মাসিক ঘরভাড়া যতদূর সম্ভব বেশী করিয়া থাকেন। এই প্রতিযোগিতার বাজারে ঘরভাড়া, লাইসেন্স, কর্ম্মচারীর বেতন ইত্যাদি ব্যবসার আয়ের দ্বারা সঙ্কুলান না হইলে, কিছুদিন পরেই কারবার গুটাইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় আর একজন গ্রাহক জুটিয়া যায়। কাজেই কলিকাতার ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে বাড়ীওয়ালা ছাড়া ব্যবসায়ীদের লাভ অল্পক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। আজকাল অধিকাংশ বাড়ীওয়ালা ঘরভাড়া বাকী পড়ার ভয়ে দৈনিক ভাড়া আদায় করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের একদিনেরও ভাড়া লোকসানের আশঙ্কা থাকে না।

বাহিরে আড়ম্বর ভিতরে ফাঁপা

আমরা কোন দোকানের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র দেখিয়াই মনে মনে অনুমান করিয়া লই যে, এই দোকানে বার্ষিক এত টাকা লাভ হয়। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, অনেক মাড়োয়ারী সন্ধ্যার পর পাগড়ী মাথায় হুণ্ডি বা হাতচিঠির তাগাদায় আসিয়াছে। এই সমস্ত কারবারের লাভের অধিকাংশ মাড়োয়ারীদের হুণ্ডির টাকার সুদেই চলিয়া যায়। তারপর জামা-কাপড়ের দোকানে

রীতিমত লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ হয় কিনা, তাহাতে আমার একটা সন্দেহ আছে। মজুত মালের মূল্য ধরিয়া ঘাঁটতি মালের হ্রাসমূল্য না ধরিলে, মালিকের প্রকৃত মুনাফা অনুমান করা শক্ত। যাহা হউক, একটু বড় রকমের জামা-কাপড়ের দোকানে (ঘর ভাড়া ও লোকজনের মাহিনা ইত্যাদিতে) মাসিক অন্ততঃ ন্যূনকল্পে ৪।৫ শত টাকা ব্যয় হয়। একমাত্র পূজার সময় ছাড়া বারোমাস সমানভাবে জামা-কাপড় বিক্রয় হয় না। ইহার উপর এই সমস্ত দোকানের সংখ্যা যেরূপ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে ইহার পরিণাম আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। তারপর দরিদ্রের দেশ বাংলায় বিলাসিতার সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের মধ্যে দিন দিন হ্রাস ছাড়া বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদের অধিকাংশ মাল-মসলা রেশমী কাপড়, ছিটের কাপড়, জরি ইত্যাদি, ভারতের বাহির হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কাজেই একটা পোষাকের মূল্যের বারো আনা ভাগ বিদেশে চলিয়া যায়, আমাদের দেশে মাত্র মজুরীর দরুণ চারি আনা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

ভ্রান্ত পথ

বাঙালী ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিয়াছে, ইহা খুব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙালী যে-পথটি ধরিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই অভ্রান্ত বলিতে পারি না। জামা, কাপড়, পোষাকের দোকান—পনেরো আনা বাঙালীদের। এই জাতীয় ব্যবসার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়া পরস্পরের অন্ন কাড়াকাড়ি চলিতেছে। ইহার ভবিষ্যৎ এই দাঁড়াইবে যে, অধিকাংশ ব্যবসায়ী কষ্ট-সঞ্চিত মূলধন হারাইয়া,

ঋণের বোঝা ঘাড়ে লইয়া একদিন ঘরে ফিরিতে বাধ্য হইবে। কোন বাঙালী ব্যবসায়ীর একটি দোকান ভাল চলিতেছে দেখিয়া ঠিক তাহারই পাশে যদি সেই জাতীয় আর একটি কারবার অপর একজন বাঙালী ফাঁদিয়া বসেন, তাহাতে উভয়েরই লোকসান্ হইবে। সে-ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি করিয়া, সস্তা দামের প্রলোভন দেখাইয়া, খরিদ্দার ভাগাভাগি করিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। পুরাতন ব্যবসায়ী পূর্ব্বে কিছু লাভ করিয়া লওয়ায় কিছুকাল লোকসান সহ্য করিয়াও টিকিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যিনি নূতন করিয়া কারবার খোলেন, তিনি যদি কারবারের মাসিক খরচাটাও কারবার হইতে তুলিতে না পারেন, তবে অচিরেই তাঁহাকে কারবার গুটাইতে হয়।

দেওয়ানী আদালতে সংবাদ লইলে জানা যায়, দেউলিয়া মোকদ্দমার সংখ্যা কি ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে! ইহা ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালীর উন্নতি-অবনতি সূচিত করে। বাংলাদেশে যেমন চাহিদার অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের ফলে, পাটের দাম অতিরিক্ত হ্রাস পাইয়াছে, এমন কি, বর্ত্তমান মূল্যে চাষের ব্যয়ও সঙ্কুলান হয় না, সেইরূপ যদি ক্রেতার সংখ্যার চেয়ে দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে সকলেরই মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়।

ব্যবসায়ে বাঙালীর পথ নির্দ্দেশ

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের আধিপত্যে সেদিকে বাঙালীর পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। বাঙালী বর্ত্তমানে কোন্ পথে ব্যবসায়ে অগ্রসর হইবে, সর্ব্বসাধারণের মনে এই প্রশ্নই আজ জাগিয়াছে। অ-বাঙালীদের ব্যবসায় আজ কেবল কলিকাতা সহরেই সীমাবদ্ধ নাই, বাংলার সর্ব্বত্র, এমন কি, সুদূর পল্লী অঞ্চলে পর্য্যন্ত অ-বাঙালীর দল নানাপ্রকার চালানী মালের ব্যবসা চালাইতেছে। বাঙালীরা যদি সন্ধান লইয়া ঐ সমস্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া অ-বাঙালীদের সহিত কিছুদিন প্রতিযোগিতা চালাইতে পারে, তবে ঐ সমস্ত অ-বাঙালীর দল ক্রমশঃ পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। হাজার হাজার মাইল দূর হইতে বাংলায় আসিয়া যদি তাহারা ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, বাঙালীর ছেলেরা নিজেদের দেশে বসিয়া তাহা পারিবে না কেন? এজন্য চাই কয়েকটি গুণ—চিন্তাশীলতা, অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রমশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা। নতুবা অ-বাঙালী ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতার মধ্যে স্থান করিয়া লওয়া কখনই সহজসাধ্য হইবে না। যে-কোন ব্যবসায় করিতে হইলে পূর্ব্বে ঐ ব্যবসায় সংক্রান্ত আবশ্যকীয় সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যিনি যত বেশী সংবাদ রাখিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন, ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া তিনি তত বেশী সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন।

হিসাব-পত্র

কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কি ভাবে ব্যবসার হিসাব-পত্র রাখিতে হয়, মোটামুটি সে সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

না করিয়া কাহারও ব্যবসায়ে হাত দেওয়া উচিত নহে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য I. Com., B. Com. পাশ করিবার দরকার নাই। আমাদের সাধারণ বাঙালী ব্যবসায়ীরা যে ভাবে বাংলা খাতায় হিসাব রাখেন, তাহা শিক্ষা করিলেই যথেষ্ট। ইংরাজিতে হিসাব রাখা অপেক্ষা বাংলায় হিসাব রাখা সহজ। বাংলায় একমাত্র খাতা ও খতিয়ান রাখিলেই চলে। ইংরাজিতে হিসাব রাখিতে গেলে অনেকগুলি খাতার দরকার হয় এবং তাহাতে বেশী লোক না হইলে চলে না। আমাদের দেশে বাংলা হিসাব শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান নাই। ইংরাজি হিসাব 'বুককিপিং' শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল কলেজ কলিকাতায় আছে। তাহার কোন প্রয়োজন নাই। কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেক ব্যবসায়ী কিংবা তাঁহাদের কর্ম্মচারীর নিকট বাংলা-হিসাব শিক্ষা করা যায়। যদি কাহাকেও কোন ব্যবসায়ীর নিকট বিনা বেতনে বেগার খাটিয়া উহা শিক্ষা করিতে হয়, নিজে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাহা শিখিয়া লওয়া উচিত। নতুবা কোন ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারীর নিকট দৈনিক দুই এক ঘণ্টা শিক্ষা করিলেও এক মাসের মধ্যেই মোটামুটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইবে। বাংলার সর্ব্বত্রই সে সুযোগ আছে।

ব্যবসায়ীর সঙ্কীর্ণতা

কোন কোন ব্যবসায়ী বিনা বেতনে সাময়িক সাহায্যকারী হিসাবেও এ জাতীয় শিক্ষানবীশ লোক রাখিতে সাহস করেন না। ভয়, পাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়! ব্যবসায়ীর এ ভয় হয়তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু শিক্ষানবীশ ছাড়াও আজকাল সমস্ত ব্যবসায়ে যখন প্রতিদ্বন্দ্বীর লোকাভাব নাই, তখন ব্যবসায়ীদের এজাতীয় সংকীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ

করিয়া বাঙালী জাতিকে ব্যবসামুখী করিবার চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান দিনে প্রতিযোগিতা নাই এমন কোন ব্যবসাই নাই। কাজেই ব্যবসায়ে একচেটিয়া লাভ করিবার দিন গিয়াছে। আজ অ-বাঙালীরা যখন আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, তখন বাঙালীর মধ্যে যাহারা ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীমাত্রেরই উচিত নহে কি? বাঙালী ব্যবসায়িগণের পরস্পরের প্রতি এ জাতীয় সহানুভূতি থাকিলে অদূর-ভবিষ্যতে তাহাদের একটা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ আসিবে, তাহা হইলে অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের ক্রমশঃ বাংলার ব্যবসাক্ষেত্র হইতে দূরে রাখা সহজসাধ্য হইবে।

হুণ্ডি

মফঃস্বলের অনেক মোকামের বাঙালী ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় টাকা পাঠাইবার ব্যয় ও দায়িত্ব বাঁচাইবার জন্য মফঃস্বলস্থ অনেক অ-বাঙালী চালানী ব্যবসায়ীদের,—পাট, ধান, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি খরিদের জন্য নিজেদের তহবিলের টাকা হাওলাত দিয়া থাকেন। অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা উক্ত হাওলাতি টাকা পরিশোধের জন্য তাহাদের কলিকাতাস্থ আফিসে কিংবা গদীতে উক্ত মহাজনের নামে একখানি হুণ্ডি লিখিয়া দেয়। ইহাতে একপক্ষে ঐ সমস্ত স্থানীয় ব্যবসায়িগণের সুবিধা আছে। কারণ, স্থানীয় ব্যবসায়িগণের তহবিল অধিকাংশ কাঁচা টাকা ও ও রেজগীতে পরিপূর্ণ থাকে। উহা বদলাইয়া নোট সংগ্রহ করিতে না পারিলে ঐ সমস্ত নগদ টাকা ও রেজগী বস্তাবন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসা বিপজ্জনক। কাজেই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের উপকারার্থে উহা প্রদান করেন না। ইহাতে উভয় পক্ষের যথেষ্ট সুবিধা হয়। অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের

বরং বেশী সুবিধা। কারণ কলিকাতা হইতে টাকা সঙ্গে লইয়া, বিদেশে চুরি-ডাকাতির আশঙ্কায় তাহাদের আতঙ্কে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিতে হয়। তাহারা যদি স্থানীয় ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে আবশ্যকানুযায়ী মাল খরিদের টাকা প্রত্যেক দিন মোকামে বসিয়া পায়, তাহাতে ঐ সমস্ত অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদিগেরই বেশী সুবিধা। উহারা টাকা লইয়া যে হুণ্ডি লিখিয়া দেয়, ঐ হুণ্ডি কলিকাতায় পৌঁছাইতে ৪।৫ দিন দেরী হয়। উক্ত হুণ্ডী লইয়া উহাদের আফিস কিংবা গদীতে উপস্থিত হইয়া প্রথম দিন হুণ্ডী সাকরাইয়া (জানাইয়া) আসার নিয়ম। পরের দিন উহাদের নির্দ্ধারিত সময়ে উক্ত হুণ্ডীর টাকা লইতে হয়, গড়ে পাঁচ ছয় দিন পরে টাকাটা পাওয়া যায়। বাংলার বেকার-সম্প্রদায় যদি এই সমস্ত অ-বাঙালীদের করতলগত ব্যবসাগুলির অনুসন্ধান লইয়া, ঐ সমস্ত কাজ করিতে চেষ্টা করেন, তবে ক্রমশঃ তাঁহারাও স্থানীয় ব্যবসায়িগণের নিকট উহাপেক্ষা বেশী সুবিধা পাইতে পারেন। বাঙালীরা ব্যবসায়ী নহে বলিয়া হয়তো প্রথম প্রথম কেহ বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতে সাহস করিবে না। কিন্তু একবার ব্যবসায়ী নাম প্রচার হইয়া পড়িলে, তখন প্রায়ই টাকার অভাব হইবে না। যতদিন সে অবস্থা না আসে, ততদিন গ্রাম ও পল্লী হইতে নিজের মূলধন অনুযায়ী পাট, হলুদ প্রভৃতি খরিদ্ করিয়া, মফঃস্বলে মাড়োয়ারীরা যে সমস্ত মোকামে আড়ত খুলিয়া মাল খরিদ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট উক্ত মাল বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু লাভ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও অভিজ্ঞতার বিশেষ আবশ্যক। কোন্ প্রকার মাল কি দরে খরিদ করিলে, খরচ-বাদে কি প্রকার লাভ থাকিতে পারে, এ সম্বন্ধে যদি সবিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকে, তবে লোকসান হইবে।

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা

আরও দু'একটি কথা জানিবার আছে। অনেক সময় চাষীরা পাট বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে খরিদ্দারের নিকট হইতে অগ্রিম বায়না গ্রহণ করিয়া মালের ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য পাটে জল মিশাইয়া রাখিয়া দেয়। ঐ সমস্ত মাল যদি বুঝিয়া লওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকে, তবে উহা বিক্রয়ে লোকসান হইবে। কাজেই যে-কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা দরকার।

অনেকে মনে করেন ব্যবসায় করিতে আবার শিক্ষার কি আছে? যে-দরে মাল খরিদ করিব, তাহার উপর কিছু মুনাফা রাখিয়া বিক্রয় করিব, ইহাতে শিক্ষণীয় কি থাকিতে পারে! এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, আজ পঁচিশ বৎসর ব্যবসায় করিয়া, আজও এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, আমি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। এমন কি, আমি নিজে যে ব্যবসায় করিতেছি, তাহাতেও এখনো আমার শিক্ষণীয় অনেক আছে।

মাসিক-পত্রিকা

বাঙালীকে ব্যবসামুখী করিতে হইলে, বাংলা ভাষায় বাণিজ্য-বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা বিশেষ আবশ্যক। ঐ পত্রিকা যাহাতে বাংলার সর্ব্বত্র প্রচার হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলার সকল স্থান হইতে ব্যবসায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাতে প্রবন্ধ পাঠাইবেন। তাহা হইলে বাংলার কোন্ স্থানে কোন্ জিনিস উৎপন্ন হয়, এবং সে উৎপন্ন মালের কোথায় আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায় ভাল চলিতে পারে এবং কিভাবে ঐ ব্যবসায় করিলে লাভ হইবে, তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচারের সুবিধা ঘটিবে। এমন অনেক ব্যবসায় বাংলায় চলিতেছে যাহার মধ্যে কোন বাঙালী নাই। অ-বাঙালীরা ঐ

সমস্ত জিনিস খরিদ করিয়া বাংলার বাহিরে রপ্তানী করিতেছে। বাণিজ্য-বিষয়ক কোন মাসিক পত্রিকার সাহায্যে যদি ঐ সমস্ত ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য খবর সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়, তাহাতে বাঙালীকে ব্যবসামুখী করিতে অনেক সাহায্য হইবে।

শুধু উপদেশে হইবে না

বাঙালীকে শুধু ব্যবসায় করিতে উপদেশ দিলে কোন ফল হইবে না—নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকরী পন্থা দেখাইতে হইবে, কারণ তাহার উপরই সাফল্য নির্ভর করে। মূলধনের অঙ্ক বুঝিয়া ব্যবসায় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। অ-বাঙালীরা লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া যে ব্যবসায় করিতেছে, মাত্র দু'চার হাজার টাকা মূলধন লইয়া তাহাদের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে যুক্তি দেওয়া, তাহাদিগকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করারই নামান্তর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃত কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ দিতে হইবে, নতুবা বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে শুধু ব্যবসার নামে মাতিয়া উঠিয়া যাহা তাহা করিলে মূলধন হারাইয়া ধ্বংস হইতে হইবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালীর শোচনীয় দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া আজ চল্লিশ বৎসর সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া, এবং বক্তৃতায় গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ; তথাপি এ জাতির মধ্যে কোন সাড়া মিলিল না। তিনি বাঙালীকে বহু ব্যবসার সন্ধান দিয়াছেন, কিন্তু বাঙালী কি সে সম্বন্ধে কোনদিন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে! অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ডাঃ রায় হাতে কলমে ব্যবসায়ী নহেন, কাজেই তাঁহার উপদেশের মধ্যে প্রকৃত কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। মানিলাম, কিন্তু তিনি যে চিন্তা ও কল্পনার উপর (theoretical) ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহাকে বাস্তব মূর্ত্তি দিবার মত একটী লোকও এই প্রতিভাশালী জাতির মধ্যে কি মিলিল না! অনেকে বলেন, বাংলায় টাকা

নাই, ইহা মিছা কথা। সাধারণ লোকের টাকা নাই সত্য, কিন্তু যাহার আছে তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে। কিন্তু তাঁহারা কোন প্রকার দায়িত্ব বা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাইতে রাজী নহেন। সম্প্রতি কে, সি, মল্লিক মহোদয় জার্ম্মানী হইতে সেলাইয়ের কল আমদানী করিয়া কমিশন লাভে বাংলা দেশে বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহার মত একজন ধনী লোক ইচ্ছা করিলে এই বিদেশী মালের ক্যান্‌ভাস্‌ না করিয়া নিজেই স্থইং মেশিনের ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে পারিতেন।

চালানী ব্যবসা

বাংলার পাট, ধান, তেতুল, তুলা, লঙ্কা, হলুদ, কলাই, এমন কি খেংরা কাঠি পর্য্যন্ত, সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে খরিদ করিয়া অ-বাঙালীরা বাংলার বাহিরে চালান দিয়া থাকে। উহাতে তাহারা বেশ কিছু উপার্জ্জন করে। আমরা যদি ঐ সমস্ত জিনিস খরিদ করিয়া সন্ধান লইয়া, ঐ সমস্ত স্থানে চালান করিতে পারি, তাহা হইলে অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা ক্রমশঃ উহা বাঙালীর হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু আমরা তাহার কোন চেষ্টাও করি না, সন্ধানও লই না। আমরা কেবল পাঁচজনে যাহা করিতেছে, তাহারই অনুকরণে মুদি, ধোপা, নাপিত, চা-প্রভৃতির দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছি। আমরা নিজেরা মাথা ঘামাইয়া কিছু করিব না—পাঁচ জনে একটা ব্যবসা করিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছে যেমনি দেখিতে পাইলাম, অমনি তাহাদের পাশে সেই ব্যবসায় খুলিয়া বসিলাম ; ফলে সকলেই ধ্বংস !

পল্লী-অঞ্চলের লোক যত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, ততই তাহারা হয় চাকুরীর সন্ধানে, না হয় সামান্য মূলধন লইয়া ঐ সমস্ত ব্যবসায়ে ভীড় বৃদ্ধি করিতেছে। খাওয়া তো পাইস্‌ হোটেলে, তিন

পয়সার ভাত, দুই পয়সার তরকারি! পল্লী অঞ্চলের লোকের পক্ষে পল্লীর উৎপন্ন দ্রব্যের চালানী ব্যবসায় করাই সুবিধা। উক্ত ব্যবসায়ে কলিকাতার মত ঘরভাড়া, লাইসেন্স প্রভৃতি খরচ নাই। ইহাতে লাভ যদিও সামান্য থাকে, তাহা হইলেও মূলধন সমূলে ধ্বংসের ভয় নাই। সকলকেই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মালের চালানী কাজ করিবার যুক্তি দেওয়া চলিতে পারে না। যাহার যে অঞ্চলে বাস, তাহাকে সেই অঞ্চলের উৎপন্ন জিনিসের চালানী কাজ করিতে হইবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়া কোন ব্যবসায়েই হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। একটি ১৫।১৬ বৎসরের মাড়োয়ারীর ছেলেকে সুচারুরূপে কারবার চালাইতে দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাই। কিন্তু উহাতে অবাক্ হইবার কিছুই নাই। মাড়োয়ারীর ছেলেরা অতি অল্প বয়স হইতে তাহাদের কারবারের গদী কিংবা দোকানে বসিয়া পাঠাভ্যাস করে। তাহাদের অভিভাবকেরা মাঝে মাঝে উহাদের দ্বারা মালের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বলে। তারপর অনুক্ষণ দেখাশুনা করিতে করিতে খরিদ-বিক্রয় সম্বন্ধেও তাহারা অভ্যস্ত হইয়া যায়। আমবা যদি কোনদিন ব্যবসায়ী হইয়া উঠিতে পারি, তবে মাড়োয়ারীদের মত আমাদের সন্তানগণও ঐভাবে শিক্ষিত হইয়া উঠিবে।

আড়তদার

পল্লী-অঞ্চলের লোকের চালানী ব্যবসার কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে চালানী মাল বিক্রয়ের জন্য অনেক সময় কলিকাতার আড়তদারগণের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। কারণ, মফঃস্বলের চালানী মাল আমদানী করিয়া বিক্রয়ের জন্য আড়তদার-দিগের গুদামে উঠাইতে হয়। আড়তদার ঐ সমস্ত মাল বিক্রয় করিয়া নিজেদের আড়তদারী কমিশন বাদে অবশিষ্ট টাকা ব্যাপারীদিগকে

প্রদান করেন। কিন্তু আড়তদার যদি সৎপ্রকৃতির লোক না হন, তবে অনেক সময় ব্যাপারীদিগের লোকসান হয়। আড়তদারের মধ্যে সৎপ্রকৃতির লোক কম। অনেক সময়ই কত দরে মাল বিক্রয় হইল, ব্যাপারীরা তাহা জানিতে পারে না। কারণ, আড়তদারগণই ঐ সমস্ত মালের খরিদ্দার ঠিক করিয়া ব্যাপারীর মাল বিক্রয় করেন।

ব্যাপারী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত দর অনেক সময় তাহাদের নিকট গোপন রাখা হয়। যদিও আড়তদারগণ তাঁহাদের প্রকাশ্য নিয়মানুযায়ী কমিশন লন, তথাপি অনেক স্থলে প্রকৃত বিক্রয়-দর গোপন রাখিয়া সেই ফাঁকেও কিছু লাভ করিয়া থাকেন। এইভাবে আড়তদার কর্ত্তৃক মাল-বিক্রয়ে ব্যাপারীদিগের কমই সুবিধা হয়। কিন্তু সমস্ত আড়তদার যে একই প্রকৃতির তাহা নহে। উহার মধ্যে সৎপ্রকৃতিরও যে কেহ নাই এমন নহে। মফঃস্বলস্থ ব্যাপারীদের কলিকাতার আড়ত সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নাই; কাজেই তাহাদের পক্ষে সৎপ্রকৃতির আড়তদার নির্ব্বাচন করিয়া কাজ করিতে না পারিলে লাভের পরিবর্ত্তে লোকসানই হইয়া থাকে। তারপর আড়তদারগণ নির্দ্দিষ্ট আড়তদারী কমিশন ছাড়া আরও রকমারি বাজে আদায় করিয়া থাকেন। মণ প্রতি যদি ।০ আড়তদারী নির্দ্দিষ্ট থাকে, ব্যাপারীদিগের বিক্রীত মালের টাকা পরিশোধের সময় আড়তদারী, বৃত্তি, গদী-খরচ, মুটে, ভাণ্ডারী, তহরি, ডাক খরচ ইত্যাদিতে মণ প্রতি আট দশ আনা কাটিয়া রাখা হয়।

আড়তদারের মারফতে মাল-বিক্রয়

ব্যাপারীর মাল আড়তদারের গুদামে উঠাইলে আড়তদার উক্ত মালের একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সিকি পরিমাণ টাকা নিজেদের হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট তিনভাগ টাকা ব্যাপারীদের অগ্রিম

প্রদান করে। উক্ত টাকায় ব্যাপারীগণ পুনরায় মাল খরিদ আরম্ভ করে। এই অগ্রিম টাকা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ আড়তদার ব্যাপারীর নিকট হইতে হাতচিঠা কিংবা রসিদ লেখাইয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাপারী যে মাল দেয়, তজ্জন্য আড়তদার ব্যাপারীকে কোন রসিদ দিতে রাজী নহেন। কারণ, যদি ব্যাপারী-প্রদত্ত মাল বিক্রয়ের সময় ওজনে কম হয়, এবং তজ্জন্য যদি কেহ ভবিষ্যতে কোন প্রকার দাবী করে, কাজেই আড়তদার ফাঁদে পা দিতে রাজী হন না। বর্ত্তমান নীতিতে আড়তদার মাল বিক্রয় করিয়া যদি বলেন যে, মালের ওজন কম হইয়া গিয়াছে, ব্যাপারী তাহাই মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ চালানী মালের লাভ-লোকসান অনেক সময় আড়তদারের সততার উপর নির্ভর করে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমারই স্বগ্রামবাসী কানাইলাল দাস নামক জনৈক বেকার যুবক পল্লী-অঞ্চল হইতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলিয়া নিজেরা নৌকা চালাইয়া কতকগুলি ঝুনো নারিকেল বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আসে। উক্ত কানাইলাল দাস কলিকাতায় কোন্ স্থানে নারিকেল বিক্রয় হয়, তাহা জানিত না। আমার পরামর্শ লইয়া উক্ত কানাই-লাল দাস বেলিয়াঘাটায় আড়তে উহা বিক্রয় করিতে যায়। উক্ত নারিকেল আড়তদারের গুদামে তুলিয়া দিলে, আড়তদার উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া টাকা দিবেন বলায়, ২৬৩৩টি নারিকেল আড়ত-দারের গুদামে উঠাইয়া দেওয়া হয়। নারিকেলগুলি তুলিয়া দেওয়া হইলে আড়তদার বলেন, "আপাততঃ তুমি ৬০৲ টাকা লইয়া বাড়ী যাও। পরে নারিকেল বিক্রয় হইলে অবশিষ্ট টাকা মণিঅর্ডারে দেশে পাঠাইয়া দিব।" ইহাতে কানাইলাল দাস জিজ্ঞাসা করে, "আপনার সহিত কথা ছিল, আপনার গুদামে মাল উঠিয়া গেলে উহার মূল্য স্থির করিয়া আপনি আমাকে টাকা দিবেন, এক্ষণে কথার

হের-ফের করিতেছেন কেন?" আড়তদার উত্তর দিলেন "আমরা কোন মাল খরিদ করিয়া রাখি না; মাল বিক্রয় করিয়া আমাদের আড়তদারী কমিশন বাদে অবশিষ্ট টাকা ব্যাপারীকে প্রদান করিয়া থাকি।" যাহা হউক, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর উক্ত কানাইলাল দাস আড়তদারের প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। কারণ, আড়তদারের গুদামে একবার মাল উঠিয়া গেলে সেখান হইতে উহা ফেরত লইয়া অন্যত্র বিক্রয় করা চলে না। আড়তদারের সহিত চুক্তি রহিল যে, নারিকেল বিক্রয় হইয়া গেলে প্রতি হাজারে ২৲ আড়তদারী ও ।৷৹ আনা দান কাটিয়া লইয়া বাকী টাকা কানাইলাল দাসকে দেওয়া হইবে। কানাইলাল দাসের উপস্থিতিতেই একহাজার নারিকেল ৪৫৲ টাকায় বিক্রী হয়। উহার মধ্যে ২৷৷৹ টাকা আড়তদারী ও দান কাটিয়া লইয়া ৪২৷৷৹ টাকা কানাইলাল দাসের নামে আড়তদার খাতায় জমা রাখিলেন, এবং অগ্রিম ৬০৲ টাকা দিয়া তাহার নিকট হইতে একটা রসিদ লইলেন। কানাইলাল দাস উক্ত গচ্ছিত মালের রসিদ চাহিলে, উহা আড়তদার দিতে রাজী হইলেন না। পরে কানাইলাল দাস আমার জনৈক কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া আড়তদারের নিকট হইতে অবশিষ্ট টাকা লওয়ার জন্য মুকাবিলা করিয়া দেশে চলিয়া গেল। ২৬৩৩টি নারিকেলের মধ্যে আড়তদার ২৭১টি নিজেদের এবং কর্ম্মচারীর দান-খয়রাত বাদে ২৩৬২টি নারিকেল বিক্রয় করিয়া যে ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, পরপৃষ্ঠায় তাহার অবিকল নকল দেওয়া হইল। প্রকাশ থাকে যে, নারিকেলের প্রকৃত বিক্রয়-মূল্য হইতে প্রতি হাজারে ২৷৷৹ টাকা হিসাবে পূর্ব্বেই কাটিয়া লইয়া ফর্দ্দে টাকা জমা করা হইয়াছে। আড়তদার-প্রদত্ত নিম্নলিখিত ফর্দ্দ দৃষ্টে আড়তদারী ব্যবসায় সম্বন্ধে সাধারণের একটা অভিজ্ঞতা লাভ হইবে।

৺শ্রীশ্রীকালী

সন ১৩৪৩

শ্রী..................................

বাজে মালের আড়ৎ

ঠিকানা..........................

পোঃ বালিয়াঘাটা, কলিকাতা।

হিসাব শ্রীকানাইলাল দাস, সাং খলিষখালী

জমা		খরচ	
১৫ আশ্বিন—		১১ আশ্বিন—	
নারিকেল ১০০০ × ৪২॥০		কুত	২॥১০
	২৫ × ১৵০	খরচা	১৷৴৫
	৪৩॥৴০		৩৸৴১৫
১৭ রোজ—		১৫ রোজ—	
নারিকেল ১১৫০		গুঃ খোদ	৬০৲
দর ২৮॥০ হিঃ ৩২৸৫		৺বৃত্তি	৷৴৫
	৭৬৷৴৫	গদী খরচ	৷৴০
		আড়তদারী	২॥৶১০
		মুটে	১৷৵১৫
		তহরি	॥০
		ভাণ্ডারী	৶০
		ডাক খরচ	৶০
		১৭ রোজ—	
		গুঃ খোদ	৭৲
			৭৬৷৴৫

২নং ফর্দ্দ

১৬২ নারিকেল		খরচ—	
২০৲ হিঃ ৩।০		গুঃ যোগেন্দ্র বিহারী রায় (গ্রন্থকারের কর্ম্মচারী)	
২৫টি	।/০	কৌং ৩॥/০	
	৩॥/০		

আড়তদারের উক্ত ফর্দ্দে ২৬৩৩টি নারিকেলের মধ্যে ২৩৬২টি বিক্রয় দেখান হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৭১টির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, উক্ত নারিকেল—খরিদ্দার, দালাল, কর্ম্মচারিগণের প্রাপ্য হইয়াছে। প্রথম দফায় যখন ১০০০ নারিকেল ৪৫৲ টাকায় বিক্রয় হয়, তখন আড়ত-দারী ও দান বাবতে ২॥০ টাকা কাটিয়া লইয়া ৪২॥০ টাকা ফর্দ্দে কানাই-লাল দাসের নামে জমা করা হইয়াছিল। কিন্তু কানাইলাল দাসের অনুপস্থিতিতে পরে যে সমস্ত নারিকেল বিক্রয় হইয়াছে, উহার আড়ত-দারী কাটিয়া লইয়া হিসাবে টাকা জমা করা হইয়াছে কিনা, তাহা হিসাব হইতে বুঝিবার কোন উপায় নাই। আড়তদার ২॥৶১০ টাকা যাহা ফর্দ্দের মধ্যে আড়তদারী বলিয়া খরচা লিখিয়া লইয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য কানাইলাল তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিল না। কাজেই আড়তদার দয়া করিয়া যাহা দিবেন, ব্যাপারী তাহাই লইতে বাধ্য। কানাই দাসের উক্ত নারিকেল ৬৯৲ টাকায় খরিদ ছিল, এবং আড়তদার কর্ত্তৃক উহা ৭৯৸/৫ টাকায় বিক্রীত হইয়া ৯।/৫ খরচ বাদে ৭০॥/০ টাকা তাহার প্রাপ্য হইয়াছিল। মাত্র ১॥/০ টাকা তাহার লাভ দেখা যাইতেছে। নৌকা ভাড়া, তিনজন লোকের যাতায়াত ১২-১৪ দিনের পথের খোরাকী ইত্যাদি ধরিলে তাহার লোকসান হইয়াছে। কাজেই আড়তদারের মারফতে মাল বিক্রয় করিয়া সুবিধা হয় না। যে নারিকেল প্রথমে প্রতিহাজার ৪৫৲ টাকা দরে বিক্রয়

হইয়াছিল, কানাইদাসের অনুপস্থিতিতে তাহাই শেষ পর্য্যন্ত প্রতি হাজার ১২॥০ টাকা বিক্রয় হইয়াছে।

চালানী কারবার ও লিমিটেড্ কোম্পানী

বাংলার যে সকল মনীষী বেকার-সমস্যা সমাধানে যত্নবান্, তাঁহারা যদি কলিকাতা এবং বাংলার বড় বড় মোকামে লিমিটেড্ কোম্পানি গঠন করিয়া চালানী মাল বিক্রয়ের আড়ত খুলিতে পারেন, তাহা হইলে বাংলার বেকার-সমস্যা হয়তো অনেকটা সমাধান হইতে পারে। বাংলায় যে সমস্ত লোক চালানী ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক, ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য হইবে। আড়তদার-কোম্পানীর উদ্দেশ্য থাকিবে বেকার চালানী-ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ-প্রদানে ব্যবসামুখী করা। প্রত্যেক চালানী-ব্যাপারী এই কোম্পানীর কিছু কিছু শেয়ার খরিদ করিবে। ইহার সুফল হইবে এই যে, ব্যাপারীগণ যখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহারাও এই কোম্পানীর এক একজন অংশীদার, কোম্পানীর লাভ হইলে, সে লাভ তাহাদের মধ্যেও বণ্টন হইবে, তখন স্বভাবতঃই তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। এই কোম্পানীর যদি এক লক্ষ টাকা মূলধন নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে সাধারণের নিকট ৮০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া, বাকী ২০ হাজার টাকার শেয়ার আড়তের চালানী ব্যাপারীদের জন্য আলাদা করিয়া (reserve) রাখিতে হইবে। কারণ স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণ ব্যাপারীরা কোম্পানীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে না; তারপর সমস্ত ব্যাপারীকেও কিছু একদিনে পাওয়া যাইবে না। তাহারা আড়তের সঙ্গে কাজকারবার আরম্ভ করিলে ধীরে ধীরে কোম্পানীর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া, ক্রমশঃ তাহাদিগকে শেয়ার ক্রয় করিতে লুব্ধ করিতে হইবে। আজকাল অনেক ঔষধ-

প্রস্তুতকারক কোম্পানী তাঁহাদের আবিষ্কৃত ঔষধের প্রচার বৃদ্ধির জন্য ডাক্তারগণের নিকট কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকেন। আলোচ্য কোম্পানীরও ব্যাপারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ঠিক ঐ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যাপারীগণের সুবিধার প্রতি কোম্পানীর সর্ব্বদা সাগ্রহ দৃষ্টি থাকিবে। অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা যেমন বাংলার যে-কোন অঞ্চলের উৎপন্ন মাল চাহিদা অনুযায়ী বাংলার ভিতরে এবং বাহিরে নানাস্থানে চালান করিয়া থাকে, আড়তদার-কোম্পানীও তেমনি ব্যাপারীগণের চালানী মাল সেই সমস্ত স্থানের খরিদ্দার সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিয়া দিবেন এবং ব্যাপারীরা যাহাতে বেশী পরিমাণ লাভ করিতে পারে, সর্ব্বদা সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ব্যাপারীরা আড়তে যে-পরিমাণ মাল আমদানি করিবে, আড়তদার-কোম্পানী উহার বাজার-মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া শতকরা ১০।১৫৲ টাকা হাতে রাখিয়া বাকী টাকা ব্যাপারীদিগকে অগ্রিম প্রদান করিবেন। ব্যাপারীরা উক্ত টাকার দ্বারা পুনরায় মাল খরিদ করিয়া আড়তে চালান দিবে। ব্যাপারীরা যদি কোম্পানীর আড়তে চালানী কাজ করিয়া সুবিধা পায়, তবে তাহারা উৎসাহের সহিত এই কাজ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলার যুবক-সম্প্রদায় যদি নিজের দেশে বসিয়া বাংলার উৎপন্ন সমস্ত মাল খরিদ করিয়া উক্ত আড়তদার-কোম্পানীর সাহায্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে থাকে, তাহা হইলে অ-বাঙালী চালানী ব্যবসায়ীরা অবস্থা বেগতিক বুঝিয়া ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। মালের বাজার-দর সব সময় এক থাকে না; সর্ব্বদাই উহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য আড়তদার-কোম্পানী ব্যাপারী-গণের মাল খরিদের সুবিধার জন্য যখনকার যে বাজার-দর, তাহা ব্যাপারীগণকে চিঠির দ্বারা জানাইয়া দিবেন। তাহা হইলে মাল খরিদ করিয়া ব্যাপারীগণের লোকসানের আশঙ্কা থাকিবে না।

যদি উপযুক্ত, কর্মঠ ও বিশ্বাসী পরিচালক-কর্তৃক আড়ত পরিচালিত হয়, তবে এই কোম্পানীর পক্ষে দুই এক বৎসরের মধ্যে 'শেয়ারহোল্ডার'-গণকে (Shareholders) শতকরা ১৫।২০৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করা শক্ত হইবে না। এই কোম্পানী বাংলার নূতন নূতন শিল্পেরও যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় না হওয়ায় বাংলার অনেকগুলি কাপড়ের কল, চিনির কল, মূলধন অভাবে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। এই আড়তদার-কোম্পানী যদি ঐ সমস্ত চিনি ও কাপড়ের 'ষ্টকিষ্ট' হইয়া পুঁজি সরবরাহ করেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কোম্পানীব কলকারখানা বন্ধক রাখিয়া অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়া মহাজন বা ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার লইতে হয় না। আড়তদার-কোম্পানীকে বিক্রীত মালের উপর কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট কমিশন দিয়া, যদি টাকা পাওয়া যায়, তাহাতে এই সকল কল ও আড়তদার-কোম্পানী উভয়ই লাভবান হইতে থাকিবে। এইরূপে টাকা আদান-প্রদানে আড়তদার-কোম্পানীব কোন প্রকার ঝুঁকি নাই। কারণ তাহারা নিজেদের গুদামে মাল মজুত রাখিয়া ঐ সমস্ত কলওয়ালা-দের টাকা দিবেন। এই ভাবে বাংলা দেশের সমুদয় শিল্প অতি শীঘ্র গড়িয়া উঠিতে পারে এবং বাংলার বেকার-সমস্যারও বহুল পরিমাণে সমাধান হইতে পারে।

বেকার-সমস্যা সমাধানে

বাঙালীর হাতে যদি কোন কাজ-কারবার না থাকে, তবে বাংলার বেকার সমস্যা সমাধান হওয়া শক্ত—আজও শক্ত, কালও শক্ত। সুতরাং এই জাতীয় কোম্পানী যত বেশী স্থাপিত হয় ততই সুবিধা। আর বাংলার বেকার যুবক-সম্প্রদায়কে সাহায্য করার উদ্দেশ্য লইয়াই যদি পরিচালকগণ এ কাজে ব্রতী হন, তবে অনেক লোকের অন্ন সংস্থানও

অবাধেই হইতে পারে। বাঙালী ছাড়া অ-বাঙালীকে এই কোম্পানীর সহিত কোন ভাবেই সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখা হইবে না, কোম্পানীর ইহা হইবে একটি বিশিষ্ট নিয়ম। ইহাতে বাঙালীদের কেহ চাকুরী পাইবে, কেহ বা কমিশনে দালালী করিবে। আর পল্লী অঞ্চলের লোকেরা আড়তে মাল যোগান দিয়া চালানী-ব্যবসায় চালাইবে।

এই জাতীয় একাধিক কোম্পানী স্থাপিত হইলেও আপাততঃ প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নাই, বরং এরূপ কোম্পানীর সংখ্যা যত বেশী হইবে, ততই ভাল। কারণ একটিমাত্র কোম্পানী কর্তৃক সমগ্র বাংলা দেশের কার্য্য পরিচালন অসম্ভব। মফঃস্বল হইতে পাট, ধান, চাউল, গুড়, কলাই, মশুরী, লঙ্কা, হলুদ, তেতুল, তূলা, সুপারি, মাদুর প্রভৃতি বহু প্রকারের মাল আমদানী হয়। কলিকাতায় এইরূপ বিভিন্ন মালের বিভিন্ন আড়ত আছে। সর্ব্বপ্রকার মালের কাজ এক আড়তে হয় না—হওয়া সম্ভবও নহে। যদিও বা সম্ভব হয়, উহা সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে কিনা সন্দেহ; সে-ক্ষেত্রে অর্থ ও উদ্দেশ্য দুইই নষ্ট হইবে। কোম্পানীর নিয়মাবলীতে যতগুলি কাজে হাত দিবার পরিকল্পনা থাকিবে, সব গুলিতেই একসময়ে হাত দেওয়া উচিত হইবে না। কয়েকটি কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা, উহা বিশেষরূপে পরীক্ষার পর তবে অন্যান্য কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। তাড়াহুড়া করিয়া একসঙ্গে সমস্ত কাজ আরম্ভ করিলে, অভিজ্ঞতার অভাবে আমাদের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় ব্যবসায়ীরা বিফলতার তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়াই ঘরে ফিরিবেন। যোগ্য, কর্ম্মঠ ও বিশ্বাসী লোকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইলে এই জাতীয় ব্যবসার দ্বারা কোম্পানীর তথা জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

ক্রম-প্রসার

এই সকল কোম্পানী যদি দাঁড়াইয়া যায়, তবে "ব্যবসায়ে বাঙালীর

দুর্গতির কারণ" সম্বন্ধে আমি আমড়াতলার গুজরাটী, কচ্ছি প্রভৃতি জাতির ব্যবসায়ের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, ক্রমে তাহাতেও হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব হইবে না। কারণ ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীরা যে যে স্থান হইতে মাল আমদানি করিয়া কলিকাতায় বাঙালী ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করে, আমাদের কোম্পানীগুলিও যদি সে সকল স্থান হইতে মাল আমদানি করে, তবে বাঙালী ব্যবসায়ীদিগের সহানুভূতি লাভ করা যাইতে পারে। তবে এক সঙ্গে সমস্ত মালের আমদানী করিতে গেলে হয়তো একটা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। তজ্জন্য একবারে এক একটি মালের কাজ আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অন্যান্য জিনিস আমদানি করিতে হইবে। বাঙালীকে বাংলার ব্যবসাক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করিতে হইলে ব্যক্তিগত চেষ্টার ও অর্থের উপর নির্ভর করিয়া কোন সুফল হইবে না। এই জাতীয় লিমিটেড্ কোম্পানী গঠন করিয়া চেষ্টা করিতে পারিলেই একমাত্র উহা সম্ভব হইতে পারে।

সরিষা

বাংলার উৎপন্ন বহু মাল যেমন অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা বাহিরে রপ্তানি করে, তেমনি আবার রেঙ্গুন চাউল, সরিষা, তিসি, কলাই প্রভৃতি বিদেশের উৎপন্ন অনেক মাল উহারা বাংলায় আমদানিও করিয়া থাকে। কলিকাতা এবং মফঃস্বলে অনেক তেলকল আছে। ঐ সমস্ত কলে লক্ষ লক্ষ বস্তা সরিষা প্রয়োজন হয়। ঐ সমস্ত সরিষা সমস্তই অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা পাঞ্জাব, বেহার ও মধ্যপ্রদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে। যদি আড়তদার কোম্পানী উহা আমদানি করিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই সমস্ত বাঙালী কলওয়ালাদিগের সহানুভূতি পাওয়া যাইতে পারে। বাংলার বেকার যুবক-সম্প্রদায় এই ব্যবসাটি গ্রহণ করিতে পারেন। ইহারা ২।৩ জনে সমবেত ভাবে যদি দু'চার হাজার

টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া উক্ত প্রদেশের ঐ সমস্ত সরিষা খরিদ করিয়া আড়তদার-কোম্পানীকে চালান করেন, এবং আড়তদার-কোম্পানী যদি উক্ত মালের রেল রসিদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত ব্যাপারীকে পুনরায় মাল খরিদের জন্য টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষই লাভবান হইতে থাকিবে। আড়তদার-কোম্পানী ইচ্ছা করিলে ঐ সমস্ত আমদানি সরিষা নিজেরা খরিদ করিয়াও মজুত রাখিতে পারেন। পরে উহার বাজার-মূল্য বৃদ্ধি হইলে বিক্রয় করিয়া নিজেরা লাভবান্ হইতে পারেন; কিংবা কমিশন লাভে উহা বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন।

হাজারীবাগ রোডে প্রত্যেক বুধবার হাটের দিনে সুদূর পল্লী-অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে সরিষা আমদানি হইয়া থাকে। অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা উহা খরিদ করিয়া প্রতি মণে দুই এক আনা লাভ রাখিয়া কলিকাতাস্থ মহাজনদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। এই সমস্ত ব্যাপারী-দের মূলধন খুব বেশী নহে। উহারা রেলে মাল চালান করিয়া মহাজনকে রেল-রসিদ প্রদান করিলেই টাকা পায় এবং সেই টাকায় পুনরায় মাল খরিদ করে। বাঙালীর ছেলেরা যদি ঐ সকল অঞ্চলে গিয়া ঐ জাতীয় কাজ করিতে পারে এবং আড়তদার-কোম্পানী যদি রেল-রসিদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অল্প মূলধনেও বেশী টাকার খরিদ-বিক্রয় চলিতে পারে। মোটামুটি লাভের একটা অনুমানিক হিসাব দেওয়া যাক্। খরিদ দরের উপর যদি প্রতি মণে এক আনা হিসাবেও লাভ থাকে, আর একটা মরশুমে অর্থাৎ ৪।৫ মাসে যদি বিশ হাজার মণ সরিষা খরিদ-বিক্রয় হয়—যাহা মোটেই অসম্ভব নয়—তবে ১২৫০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। মরশুমের সময় প্রতি মণ সরিষা ৩৲, ৩।০ টাকা দরে খরিদ করা যায়। এক রেল সরিষা, অর্থাৎ ৩০০।৩৫০ মণ সরিষা খরিদ

করিতে অন্ততঃ ১০০০।১২০০৲ টাকা প্রয়োজন। অন্ততঃ দুই তিন রেল মাল খরিদের টাকা পুঁজি না থাকিলে কাজ আরম্ভ করা চলে না। সব সময়েই মূলধন অনুযায়ী ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। কর্ম্মচারী রাখিয়া ব্যবসা করিতে হইলে খরচ বেশী হয়। সমস্বার্থ-বিশিষ্ট দুই তিন জন মিলিয়া কাজ করিলে ভাল হয়, এবং হঠাৎ একজন পীড়িত হইলেও কাজ বন্ধ (deadlock) হয় না। এই কারবারে দুই একটী স্থানীয় লোক নিযুক্ত করিলে সুবিধা হয়। তাহারা লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সস্তায় মাল আমদানি করিয়া দিতে পারে। এই কাজ করিতে হইলে শুধু কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিলে লাভ হইবে না, রীতিমত অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। সরিষা খরিদ করিতে হইলে কোন্ সরিষায় কি পরিমাণ তেল হইবে, এবং কোন্ মোকামের কি প্রকার মাল তেল-কলওয়ালারা আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিবে, এ সমস্ত অভিজ্ঞতা না থাকিলে লোকসান অনিবার্য্য। জিনিষ চেনা, বাজার-দরের উঠ্‌তি পড়্‌তির সংবাদ রাখা, এবং হিসাব রাখা—এই তিনটি কাজ না শিখিয়া কাহারও ব্যবসা আরম্ভ করা উচিত নহে। চাকুরীর গুন্‌তি টাকায় বাঁধাধরা নিয়মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বাঙালীর পক্ষে এসব ঝঞ্ঝাট বলিয়া মনে হইবে বুঝি, কিন্তু উপায়ই বা কি? ঝঞ্ঝাট ছাড়া বর্ত্তমান দিনে পেটের ক্ষুধা মিটিবার 'নান্য পন্থা'।

বর্ত্তমানে সাধারণ বাঙালীর-কোন মূলধন নাই, বলিলেই চলে। দুই চার জনে মিলিয়া যদিও বা মূলধন সংগ্রহ করিল, কিন্তু মাল-বিক্রয়ের জন্য বিশ্বস্ত আড়তদার চাই। **আড়তদারের সহায়তা ভিন্ন চালানি কাজ করা একরূপ অসম্ভব।** বাঙালীকে ব্যবসামুখী করিতে হইলে মূলধন সরবরাহের জন্য আড়তদারী প্রতিষ্ঠান থাকা চাই-ই। বর্ত্তমানে দেশে বসিয়া বাঙালী যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাতে বিদেশে গিয়া ঐ জাতীয় কাজ করিবার জন্য লোকের হয়তো অভাব হইবে না।

কিন্তু মাল বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য যদি কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান না থাকে, তবে ঐ সমস্ত সামান্য মূলধনের ব্যাপারীরা প্রভূত অর্থশালী ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতার মুখে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিবে না—একেবারে মারা পড়িবে।

সুপারি

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার "জীবন-সংগ্রামে বাঙালী" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, বরিশাল জেলায় প্রচুর সুপারি পাওয়া যায়। অ-বাঙালীরা ঐ সমস্ত সুপারি খরিদ করিয়া নানা স্থানে চালান করে। কিন্তু বাঙালীরা কেহ ঐ ব্যবসায়ে হাত দেন না। তাহার একমাত্র কারণ, অ-বাঙালীরা ঐ সমস্ত মাল কোথায় কাহাদের নিকট বিক্রয় করে, বাঙালীরা তাহার কোন সংবাদই রাখে না কিম্বা রাখিবার চেষ্টাও করে না। ঐ সমস্ত ব্যবসা চালাইবার মত উপযুক্ত ধনী যে এদেশে নাই তাহা বলা চলে না। কিন্তু তাঁহারা হয়তো উহা ঝঞ্ঝাট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে ঝঞ্ঝাট ভিন্ন অর্থাগমের পথ কোথায়?

আড়তদার কোম্পানী যদি ঐ সমস্ত স্থানে ব্রাঞ্চ (শাখা) আড়ত স্থাপন করেন, এবং স্থানীয় বেকার-সম্প্রদায় সামান্য কিছু মূলধন লইয়া পল্লী-অঞ্চল হইতে সুপারি খরিদ করিয়া ঐ সমস্ত আড়তে বিক্রয় করেন, দৈনিক ॥০, ॥৵০ বেশ উপার্জ্জন হইতে পারে। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে উহা কম লাভ নয়। কিম্বা আড়তদার কোম্পানী নিজেই যদি বরিশাল, নোয়াখালি-অঞ্চলের সুপারিগুলি খরিদ করিয়া একচেটিয়া করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে উহা ভিন্ন স্থানে চালান না করিয়াও লাভ করিতে পারেন। যে সকল ব্যবসায়ীরা আজকাল ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, তাহারা বাধ্য হইয়াই আড়তদারকে

কিছু মুনাফা দিয়া উহা খরিদ করিবে। ইহাতে স্থানীয় বেকার-সম্প্রদায় ও আড়তদার উভয়েই লাভবান হইবে। কিন্তু ইহাতে একটু ঝুঁকি (risk) আছে। যদি কোন বৎসর উক্ত অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা আড়তদারের নিকট মাল খরিদ না করে, তাহা হইলে উহা গুদামে পড়িয়া নষ্ট হইবে কি? যে সমস্ত অ-বাঙালীরা উহা খরিদ করে, তাহারা নিশ্চয়ই লাভ পাইয়া অন্য কোথাও ইহা বিক্রয় করিয়া থাকে। আড়তদার কোম্পানীকে তাহারও সন্ধান লইয়া রাখিতে হইবে যেন প্রয়োজন হইলে সেই সকল স্থানে মাল বিক্রয় করা যাইতে পারে। কোন্ জিনিষ কোথায় উৎপন্ন এবং কোথায় বিক্রয় হয়, এই সংবাদের উপর ব্যবসার লাভালাভ অনেকাংশে নির্ভর করে।

চালানী-ব্যাপারী

পূর্ব্ববঙ্গে একপ্রকার চালানী-ব্যাপারী আছে। তাহারা অধিকাংশই মুসলমান। ইহাদের নিজেদের নৌকা আছে। ঐ সমস্ত নৌকায় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের যে যে অঞ্চলে যে যে জিনিসের বেশী আমদানি এবং দর সস্তা, তথা হইতে সে সকল জিনিষ—যেমন, বালাম চাউল, লঙ্কা, হলুদ, ধনে প্রভৃতি খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই দিয়া ইহারা কলিকাতায় আমদানি করে। ঐ সমস্ত মাল কলিকাতায় বিক্রয় করিয়া ইহারা সর্ষিষার তেল, লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি জিনিস খরিদ করিয়া, দেশে যাওয়ার পথে নদীর ধারে ছোট বড় যত ব্যবসা-কেন্দ্র আছে, কিছু কিছু লাভ পাইয়া সেখানে বিক্রয় করে। তাহাতে তাহাদের আসা-যাওয়া দুই-ই লাভের হয়। ইহারা নিজেরা মাঝি এবং সকলেই মুনাফার অংশীদার। ইহারা "ভাসান ব্যাপারী" নামে অভিহিত হয়। আমার বিশ্বাস, বাঙালীর ছেলেরা এই দারুণ অর্থ-

কষ্টের দিনে ঐ সমস্ত কাজ করিতেও রাজী হয় যদি তাহারা মাল বিক্রয়ের জন্য বিশ্বস্ত আড়তদার পায়।

তখন আর এখন

বর্ত্তমানে ব্যবসাক্ষেত্রে যে-প্রকার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। তখন যিনি যে ব্যবসায় আরম্ভ করিতেন, তাহাতেই তিনি দাঁড়াইতে পারিতেন। বাঙালীকে বক্তৃতা দিয়া ব্যবসায়ে ঠেলিয়া দিলেই কিছু রাশি রাশি লাভ হইবে না; প্রকৃত কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। একে বাঙালী জাতি ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ, তদুপরি হাতে তাহার মূলধন নাই। কাজেই বাঙালীকে ব্যবসামুখী করিতে হইলে জাতির পশ্চাতে এমন কোন শক্তিশালী সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান থাকা চাই, যদ্দ্বারা এই জাতি ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বাঙালীর কৃতিত্ব প্রমাণ করিতে পারে।

আড়তদারী পরিচালন

আলোচ্য প্রবন্ধে 'আড়তদারী পরিচালন' সম্বন্ধে দু' চারিটি কথা বলিব। যদি উপযুক্ত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে আড়তদারী কোম্পানী পরিচালিত হয়, তবে প্রথম বৎসরেই কোম্পানী 'শেয়ার-হোল্ডার'গণকে আশাতীত ডিভিডেণ্ড্ (Dividend) দিতে পারিবেন। আমার এ কথা হয়তো অনেকে "আকাশে সৌধ রচনা' মনে করিতে পারেন; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা নিছক কল্পনাই নয়। প্রথমেই বলা যায়, যাহারা শুধু কমিশন লইয়া কাজ করিবে, তাহাদের লোকসান হইবে কি প্রকারে? তারপর গুদামে ব্যাপারীর মাল মজুত রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়ায় কিছুমাত্র ঝুঁকি (risk) নাই। ইহাতে ব্যাপারীর মাল আমদানির উপর কোম্পানীর লাভালাভ নির্ভর করে। চিনির কল, কাপড়ের কল খুলিতে হইলে প্রথমটা জমি, গুদাম, মেসিনারী প্রভৃতিতে মূলধনের অর্দ্ধেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়। কিন্তু আড়তদারী কোম্পানী স্থাপনে মূলধনের সমগ্র টাকা ব্যাঙ্কে মজুত থাকিবে। পরিচালন-ব্যয়ের মধ্যে গোটাকতক গুদামভাড়া, দু'চার জন কর্ম্মচারীর বেতন ও একটি লোহার আলমারী ছাড়া আর কোন ব্যয় নাই।

প্রচার-ব্যবস্থা

কোম্পানীর উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য কিছুদিন বাংলা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। মফঃস্বলে সাধারণলোক সকলে সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ পায় না। সেজন্য কতকগুলি হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া বাংলার সর্ব্বত্র বিলি করিলে ভাল হইবে। ব্যাপারী সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক

অবস্থায় ২।৪জন দালাল নিযুক্ত করিবার দরকার হইতে পারে। এইতো ব্যয়—ইহা ছাড়া আড়তদারী ব্যবসার আর কোন বাজে ব্যয় নাই। কোম্পানীর সততা ও সহানুভূতি সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গেলে দলে দলে অসংখ্য ব্যাপারী জুটিয়া যাইবে। ব্যাপারী সংগ্রহ করিতে ৫।৬ মাসের অতিরিক্ত সময় লাগিবে না। কলিকাতা সহরে শ্যামবাজার, উল্টাডাঙ্গা, দাসপাড়া, বেলিয়াঘাটা, পোস্তা, হাটখোলা অঞ্চলে একশতেরও বেশী আড়ত আছে। ইহাদের অনেকগুলিতেই ব্যাপারীরা কোন সুবিধা পায় না। চালানী মালের তারতম্য অনুসারে ব্যাপারীদের মণ প্রতি ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা পর্য্যন্ত আড়তদারী কমিশন দিতে হয়। ইহা ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রকারের বাজে খরচ আছে। আড়তদার কোম্পানী যদি একলক্ষ টাকা মূলধন ব্যাঙ্কে মজুত রাখিয়া কাজ আরম্ভ করে, এবং কারবারের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাপারীর মাসে পাঁচ হাজার মণ মাল বিক্রয় হইবে,—আনুমানিক এইরূপ একটা হিসাব ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যান্য আড়ত-দারের ন্যায় আড়তদারী কমিশন এবং বাজে খরচ না লইয়াও শুধু মণপ্রতি ৵০ আনা হিসাবে কমিশন লইয়া মাসিক ৬০০৲ টাকার উপর আয় হইতে পারে। ক্রমশঃ ব্যাপারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে উক্ত কমিশন ৵০ আনার স্থলে ⁄০ আনা করিলেও ক্ষতি নাই। কারবারের প্রথমাবস্থায় গুদামভাড়া, কর্ম্মচারীর বেতন ইত্যাদিতে মাসিক ২০০।২৫০৲ টাকার বেশী আড়ত পরিচালনে দরকার হইবে না। ব্যাপারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকানুযায়ী গুদাম ও কর্ম্ম-চারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই চলিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক ব্যাপারীকে কোম্পানীর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের নিকট কিছু কিছু শেয়ার বিক্রয় করিতে হইবে। ব্যাপারীরা যে এই কোম্পানীর অংশীদার, এবং কোম্পানীর লাভ হইলে সে লাভ যে তাহারাও

পাইবে, ইহা বুঝিতে পারিলে আড়তের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক একটা মমতা জন্মিবে এবং বরাবরের জন্য তাহারা বাঁধা হইয়া থাকিবে। বাঙালীকে ব্যবসাক্ষেত্রে নামাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

খাম-খেয়ালী বাজার দর

অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা বাংলার উৎপন্ন অনেক জিনিষ খরিদ করিয়া এমনভাবে লাভ করিয়া থাকে যে, মনে হয় বাজার-দর যেন তাহাদের খেয়ালের উপর নির্দ্ধারিত হয়। যদি কোন বৎসরে কোন ফসল বাংলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, উক্ত ব্যবসায়ীরা তাহা সস্তায় খরিদ করিয়া এমনভাবে একচেটিয়া করে যে, যে-অঞ্চলের উৎপন্ন মাল সেই অঞ্চলেই বিক্রয় করিয়া উহাতে তাহারা লাভ করে। গত ১৩৪৩ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসে বাংলার যে সমস্ত ধান্য অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা প্রতিমণ ১৷৹ দরে খরিদ করিয়াছিল, উহা হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ২৷৹ টাকায় প্রতিমণ পড়্তা হয়। গত ১৩৪৪ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত চাউল সেই সমস্ত মোকামে ৩৴৹, ৩৵৹ দরে বিক্রয় করিয়া মণ-প্রতি তাহারা ৷৹, ৷৴৹ হিসাবে লাভ করিয়াছে। আড়তদার-কোম্পানী ইচ্ছা করিলে এই ভাবের কাজ করিয়াও বেশ লাভ করিতে পারেন।

বাঙালীর মূলধনও নাই, ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতাও নাই। একটা অনভিজ্ঞ জাতিকে ব্যবসাক্ষেত্রে শুধু ঠেলিয়া দিলেইতো চলিবে না। উহার পশ্চাতে একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকা চাই, যাহার সাহায্যে জাতির সাহস ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়। নচেৎ বাঙালীকে ব্যবসায়ে লাফাইয়া পড়িতে বলা আর আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা একই কথা। পশ্চাতে যদি কোন শক্তির সাহায্য না থাকে, দুর্দ্ধর্ব সৈনিক-দলও যুদ্ধক্ষেত্রে বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে না। একথা নিয়ত মনে রাখিতে হইবে।

ব্যাঙ্কের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্ববাদী সম্মত। পৃথিবীর সব দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যই ব্যাঙ্কের সাহায্যে উন্নতি লাভ করে। কিন্তু বাঙালীর আয়ত্তাধীন এমন কোন ব্যাঙ্ক নাই, যদ্দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্য হইতে পারে। গত কয়েক বৎসর হইল বাঙালী-পরিচালিত কয়েকটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা এখনও শৈশব অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' ফেল্ হওয়ায়, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা ৫০ হাত নীচে দাবিয়া গিয়াছে। বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ব্যাঙ্ক এই কয়েক বৎসরে নষ্ট সুনামকে পাঁচ হাত মাত্র উদ্ধার করিতে পারিয়াছে বলা যায়। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার দরুণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এই সমস্ত বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ বলা যায়, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি বর্ত্তমানে স্থায়ী আমানতী (Fixed deposit) টাকায় বার্ষিক শতকরা মাত্র ১॥০ হারে সুদ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা এত বেশী পরিমাণ টাকা আমানত পাইতেছে যে, অনেক সময় ব্যাঙ্ক টাকা আমানত রাখিতে অস্বীকার করে। অথচ বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি ১॥০ টাকার স্থলে বার্ষিক শতকরা ৪॥০ হারে সুদ দিয়াও টাকা আমানত পাইতেছে না। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি চল্তি হিসাবে (Current account) যেখানে শতকরা বার্ষিক ॥০ আনা হিসাবে সুদ প্রদান করিতেছে, বাঙালীর ব্যাঙ্কগুলি চল্তি হিসাবে সেখানে ১৲ টাকার অধিক সুদ দিতেছে। তথাপি বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতকারীর ভীড় লাগিয়াই আছে।

বাঙালী ব্যাঙ্কের অসুবিধা

বাঙালীর ব্যাঙ্কে কোন প্রকার কারবার (transaction) করিতে জনসাধারণের সাহস নাই। এই সকল ব্যাঙ্ক ধনী বা বড় বড় ব্যবসায়ীর কোন প্রকার সাহায্য পায় না। ৫৲ টাকার চেক্ দিলে ফেরত হয়, এমন সব নামীয় হিসাবের তালিকায় ব্যাঙ্কের "লেজার" ভর্ত্তি থাকে। ইহাতে বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কের দুর্ণাম হয়। অনুরোধ কিংবা খাতিরে পড়িয়া যদিই কোন ধনী বা বড় ব্যবসায়ী উহাতে চল্‌তি হিসাব খোলেন, কিন্তু টাকা জমা দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে চেক্ দিয়া তাহা উঠাইয়া লন। উক্ত টাকা দুই একদিনের জন্য খাটাইবারও ব্যাঙ্কের সুবিধা হয় না।

একমাত্র শেয়ার-বিক্রয়ের টাকা ছাড়া বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কে সুদে খাটানোর মত মজুত তহবিল বিশেষ কিছু থাকে না। কারণ বাঙালী প্রতিষ্ঠানে সাধারণের বিশ্বাস নাই। শেয়ার বিক্রয় করিয়াও কোন বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক আশানুরূপ টাকা পায় না। সুদে টাকা ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যবসা। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ মজুত তহবিল না থাকিলে কি প্রকারে ব্যাঙ্কের উন্নতি হইতে পারে? অর্থাভাবে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম যেরূপই হউক, ঘরভাড়া, কর্ম্মচারীর বেতন প্রভৃতিতে নির্দ্দিষ্ট মাসিক ব্যয় অল্প নয়। বিদেশী ব্যাঙ্ক শতকরা মাত্র ১৷৷০ সুদে স্থায়ী আমানত পায়, কাজেই তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে টাকা ধার দিতে পারে। কিন্তু বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কের তিনগুণ সুদ দিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে আমানতকারীর টাকা পায় না। কাজেই অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া বিদেশী ব্যাঙ্কের সহিত তাহারা প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয় না।

বিদেশী ব্যাঙ্কের সুবিধা

বিদেশী ব্যাঙ্কের চলতি আমানত হিসাবে দৈনিক যদি পঞ্চাশজন আমানতকারী গড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেয়, আর তাহাদের মধ্যে যদি পঁচিশজন আমানতকারী চেকের দ্বারা দৈনিক পঁচিশ হাজার টাকা উঠাইয়া লয়, তাহা হইলেও চলতি আমানতকারীদিগের দৈনিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত থাকে। উক্ত টাকায় বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে আমানতকারীদিগকে সুদ দিয়া ব্যাঙ্ক যদি বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে সুদে খাটাইয়া লইতে পারে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের শতকরা বার্ষিক ৫॥০ টাকা হিসাবে লাভ থাকে। বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি যদি চলতি হিসাবে ॥০ আনার স্থলে শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা সুদ দিয়াও যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আমানত পাইত, তাহা হইলেও ঐ পরিমাণ সুদে টাকা খাটাইয়া না হয় ৫॥০ টাকার স্থলে তাহারা ৫৲ টাকা লাভ করিত। বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি এই প্রকার অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিয়া কোন উন্নতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতেছে না। টাকার অভাবে বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যেও এই সকল ব্যাঙ্ক কোনপ্রকার সাহায্য করিতে পারিতেছে না।

লাভের টাকা হইতে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণ মজুত তহবিল না থাকিলে ব্যাঙ্ক শক্তিশালী হয় না। উক্ত রিজার্ভ ফণ্ডে যদি যথেষ্ট পরিমাণে টাকা মজুত থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক নির্ভয়ে দেশের শিল্প-বাণিজ্যে সাহায্য করিতে পারে। এমন কি, যদি কোন সময় কিছু টাকা আদায়ও না হয়, তাহাতেও ক্ষতির কারণ ঘটে না। বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কের তহবিল প্রায় সমস্তই অংশীদারগণের। কাজেই উক্ত তহবিল নিঃশঙ্কচিত্তে খাটাইতে সাহস করা চলে না। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল্ হওয়ার পর হইতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বাঙালীর একটি দুর্নাম হইয়াছে। জাতির সে দুর্নাম মুছিবার জন্য বাঙালী-পরিচালিত

ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া কার্য্য পরিচালন করিতেছেন দেখা যাইতেছে। 'No risk, no gain' প্রবাদ থাকিলেও বর্ত্তমানে এই সমস্ত ব্যাঙ্ক তাহা করিতে ভয় পায়। বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির খরচ-বাদে যাহা কিছু লাভ থাকিতেছে, তাহার অধিকাংশই অংশীদারগণকে বণ্টন করিয়া দিতে হইতেছে (Dividend)। নতুবা ব্যাঙ্কের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে অংশীদারগণের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। কাজেই বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক-গুলির দ্রুত উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অ-বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কের মনোবৃত্তি

'সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া', 'ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি কতকগুলি ভারতীয় ব্যাঙ্ক বাংলায় শাখা স্থাপন করিয়া অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে কার্য্য পরিচালন করিতেছে। কিন্তু এই সকল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ পার্শি ও পাঞ্জাবী। এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে বাঙালী বিশেষ কোন সুবিধা (privilege) পায় না। একজন পার্শি যে-কোন সময়ে উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার চাহিলে পাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ বাঙালীতো দূরের কথা, বড় বড় বাঙালী ব্যবসায়ীও যদি কোন সময় আবশ্যক বোধে সামান্য টাকা সাময়িক ভাবে ধার (Occasional overdraft) চায় তাহা পায় না। পাছে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদিগের কোন প্রকার ক্ষতি হয়—এই ভয়ে বাংলার কাপড়ের মিলওয়ালাদিগকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেও এই সকল ব্যাঙ্ক রাজী হয় না। আশঙ্কা, বাংলার কাপড়ের কলগুলি উন্নতি লাভ করিলে বোম্বাইয়ের কলগুলির ক্ষতি হইতে পারে।

ভাগ্যকুলের রায় মহাশয়েরা বাংলার বিখ্যাত ধনী। বিদেশী ব্যাঙ্কে সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রচুর টাকা জমা থাকে। সম্পত্তি বন্ধক

রাখিয়া টাকা দাদন (Loan) দেওয়া তাঁহাদের প্রধান ব্যবসা। বিদেশী ব্যাঙ্কে তাঁহাদের রাশি রাশি টাকা জমা না রাখিয়া যদি তাঁহারা নিজেরাই একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া উক্ত দাদনের ব্যবসা চালাইতেন, তাহাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বাংলার একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান হইত, এবং ইহা দ্বারা বাঙালী জাতির শিল্প-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারিত।

ভারতের সকল প্রদেশের লোকের মধ্যেই নিজেদের দেশপ্রীতির মনোভাব সুস্পষ্ট। একমাত্র বাঙালী জাতির মধ্যে এই জিনিষটির অভাব দেখা যায়। বাঙালী যদি তাহার নিজের দেশে নিজের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে না পারে, তবে এ জাতি অধঃপাতে যাইবে না তো যাইবে কে? ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালী পশ্চাৎপদ বলিয়া ইহা হয় তো তাহার অকৃতিত্বেরই পরিচায়ক, কিন্তু বাঙালীর মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সেখানেও তাহার গলদ—জাতীয়তা-বোধের দিক্ দিয়াও বাঙালী বড় অনুদার।

ব্যাঙ্ক ও শিল্প-বাণিজ্য

ব্যাঙ্কের পক্ষে বাড়ী ও সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া নিরাপদ নহে বলিয়া আমি মনে করি। তাহাতে টাকা আটকাইয়া যায় ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুদের টাকাও আদায় হয় না। উক্ত টাকা আদায়ের জন্য অনেক সময় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মামলা করিয়া টাকা আদায় করিতে হইলে ব্যাঙ্কের লোকসান হয়, এবং বহুকাল টাকা আটকা (block) পড়িয়া থাকে।

ব্যাঙ্কের পক্ষে দেশের শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়াই সুবিধা। তাহাতে টাকা আটকাইয়া থাকে না। কারণ ব্যবসায়ীদের টাকার সর্ব্বদাই আদান-প্রদান চলিতে থাকে। 'বিল অব

লেডিং'এর কার্য্যেই ব্যাঙ্কের বেশী টাকা খাটে, এবং উহাতেই ব্যাঙ্কের লাভ বেশী। অনেক ব্যবসায়ী যে-সমস্ত মাল ষ্টীমারে কলিকাতার বাহিরে চালান করে, সেই চালানী মালের ষ্টীমার কোম্পানীর রসিদ-সহ খরিদ্দারের নিকট প্রাপ্য টাকার বিল করিয়া (Bill of Lading) ব্যাঙ্কে জমা দিলে, ব্যাঙ্ক উক্ত টাকার শতকরা ৭০।৮০৲ টাকা তৎক্ষণাৎ উক্ত মাল-প্রেরককে অগ্রিম প্রদান করে। উক্ত মাল যে-দেশে প্রেরিত হয়, ব্যাঙ্ক তথাকার নিজ শাখা-আফিসের মারফতে কিংবা অন্য কোন ব্যাঙ্কের সহিত পরস্পর টাকা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রাখিয়া, উক্ত বিল অব লেডিং-এর টাকা আদায় করিয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্ক মাল-চালানদারের নিকট কমিশন পায়। এই প্রকার দাদনী কার্য্যে একদিকে যেমন ব্যাঙ্কের লাভ বেশী, অপর দিকে তেমনি নিরাপদ্‌ও বটে। ইহাতে টাকা বেশীদিন আট্‌কাইয়া থাকে না। বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলিতে এই সমস্ত কার্য্যে খাটাইবার মত যথেষ্ট টাকা নাই। কাজেই অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কের সহিত যোগসূত্র রাখিবারও উহাদের দরকার হয় না। বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার প্রভৃতি বন্ধক বা বিক্রয়ের দ্বারাই যাহা কিছু লাভ করে। বাংলার কোন কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণকেও শিল্প-বাণিজ্যে টাকা ধার দিয়া থাকে বটে, কিন্তু এই সমস্ত দাদন আশঙ্কিত-চিত্তে দিতে হয়। কারণ বাঙালী-পরিচালিত কোন ব্যাঙ্কেরই এখন পর্য্যন্ত এমন রিজার্ভ ফণ্ড নাই যে, যে-কোন ঝুঁকি সামলাইতে পারে। কাজেই ধার দিয়া যদি কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে টাকা আদায় না হয়, তাহাতে যে-কোন মুহূর্ত্তে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করিয়া বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি দ্রুত উন্নতি প্রদর্শনে সক্ষম হইবে না। তবে বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য্য পরিচালিত হইলে কিছুকাল পরে ইহারা দাঁড়াইয়া যাইবে।

ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেলের প্রতিক্রিয়া

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল্ হওয়ার পর হইতে বাঙালী-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই উপর জনসাধারণের একটা অশ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছে ; ইহা অস্বাভাবিক কিছু নহে। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের অপটুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাকেই নজির করিয়া এই জাতি যদি চিরদিনের জন্য হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, তবে বাঙালী কোনদিনই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। দস্যু-তস্কর কর্ত্তৃক অনেক সময় অনেকে হৃতসর্ব্বস্ব হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেয়? বাঙালী একবার প্রবঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া বারবারই প্রবঞ্চিত হইবে, এমন কি কথা আছে? ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি জাতিকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে হয়, তবে বাঙালীকে আর একবার ত্যাগ-স্বীকার করিয়া জাতীয়-প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথম প্রথম হয়তো দ্বিধা আসিবে, অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব মনকে পীড়িত করিয়া তুলিবে, কিন্তু সে সকলকে আমল দিলে চলিবে না—সাহসে নির্ভর করিয়া বাংলার জনসাধারণের বাঙালীকে আবার পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। নতুবা এ জাতি চিরদিনই পঙ্গু হইয়া জীবন যাপন করিবে। তারপর এক-আধটা ব্যাঙ্ক ফেল্ হইলে কি আসে যায়? কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় অনেক সময় অনেক কারবারইতো নষ্ট হইতে দেখা যায়। গরম দুধ খাইতে গিয়া যদি একবার শিশুদের মুখ পুড়িয়া যায়, তবে অতঃপর দুধের বাটি দেখিলেই তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তথাপি শিশুকে বাঁচাইবার জন্য জোর করিয়াই দুধ খাওয়াইতে হয়। আজ জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের শত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া আবার তাহাদিগকে উঠিবার সুযোগ দিতে হইবে। ব্যবসায়ে বাঙালীর একদিন পতন

হইয়াছে বলিয়া যে আর কোনদিন উত্থান হইবে না, এমন ধারণার কোন কারণ নাই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সমগ্র বাঙালী জাতি প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বাঙালীর মুখে একবার যে চূণকালি পড়িয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিবার জন্য আর একবার একট ত্যাগ স্বীকারে কি বাঙালী সাড়া দিবে না!

ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক

কলিকাতা সহরে বাঙালীর অনেকগুলি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। উহার মধ্যে দুই চারিটী ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্যগুলি আসলে লোন্ কোম্পানীর আকারে পরিচালিত হইতেছে মাত্র। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে যদি কোন একটি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সে দুর্ণাম বাঙালী-পরিচালিত সব কটি ব্যাঙ্কের ঘাড়েই পড়িবে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন চারিটী ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া যদি একটি শক্তিশালী ব্যাঙ্ক গঠিত হয়, তাহা হইলে সহজে জনসাধারণের বিশ্বাস আসিবে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক দ্বারা দেশের ক্ষতি ভিন্ন মঙ্গলের কোন আশা করা চলে না।

ব্যাঙ্ক ও আড়তদারী কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য

ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে ব্যাঙ্ক ও আড়তদারী কোম্পানীর কার্য্যের (functions) মধ্যে বাহ্যতঃ একটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় বটে, তাহা হইলেও আড়তদারী কোং অপেক্ষা ব্যাঙ্কের দায়িত্ব অনেক বেশী। কারণ Current account বা চল্‌তি হিসাবে যাহারা টাকা আমানত রাখিয়াছে, তাহাদের টাকা সর্ব্বদাই ব্যাঙ্কে মজুত রাখিতে হয়। আমানতকারিগণ যে-মুহূর্ত্তে চেক্ দাখিল করিবে, তৎক্ষণাৎ টাকা প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে একঘণ্টা সময়ও অপেক্ষা করা চলিবে না। তা'ছাড়া, ব্যাঙ্কে ৩ মাস, ৬ মাস ও এক বৎসরের মেয়াদে যে-সমস্ত টাকা রাখা হয়, তাহাও নির্দ্ধারিত দিনে শোধ করিতে হয়; এমন কি, এই মেয়াদী জমার টাকা, যদি আমানতকারী নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে, ব্যাঙ্কে 'পাশ-বই' জামিন রাখিয়া ধার লইতে চায়, তাহাও দিতে হইবে। কাজেই ব্যাঙ্ক আমানতী-টাকা ঠিক স্থায়িভাবে সুদে খাটাইতে পারে না। কিন্তু এইজন্য ব্যাঙ্ক যে আমানতকারীদের সমস্ত টাকা ঘরে আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিয়া সুদ গুণিয়া যায়, তাহা মোটেই নয়। ব্যাঙ্কে সর্ব্বদাই কেহ টাকা জমা দিতেছে, কেহ টাকা উঠাইয়া লইতেছে। এ প্রকার লেনদেন দৈনিক চলে। কাজেই ব্যাঙ্কের কোন সময়ে কোন অভাবে পড়িতে হয় না। ইহা ছাড়া 'গবর্ণমেণ্ট-পেপারে' প্রত্যেক ব্যাঙ্কের একটা রিজার্ভ ফণ্ড থাকে, হঠাৎ কোন কারণে অভাবে পড়িয়া গেলে, উক্ত

গবর্ণমেণ্ট পেপার অন্য যে-কোন ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক তৎক্ষণাৎ টাকা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার 'রিজার্ভ ফণ্ড' না রাখিলে প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যাঙ্কের বিপদ্ আসিতে পারে। টাকা আদান-প্রদানের ব্যাপারে সামান্য একটু নড়চড় হওয়ার দরুণ হঠাৎ ব্যাঙ্কের দুর্ণাম হইয়া পড়িলে, সাধারণের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু আড়তদার লিমিটেড্ কোম্পানীর হঠাৎ ঐ জাতীয় কোনই বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই কোম্পানীর সমগ্র মূলধনের টাকা ব্যাঙ্কে আমানত থাকিবে। যখন ব্যাপারীরা আড়তে মাল উঠাইয়া দিবে, তখন মালের বাজার-মূল্য ধরিয়া, শতকরা ১০।১৫৲ টাকা হাতে রাখিয়া বাকী টাকা ব্যাপারীকে অগ্রিম প্রদান করিতে হইবে। ব্যাপারীরা উক্ত টাকার দ্বারা পুনরায় মাল খরিদ করিবে। এদিকে আড়তদার-কোম্পানী বাজারের সর্ব্বোচ্চ মূল্যে ব্যাপারীর মাল বিক্রয় করিয়া অগ্রিম প্রদত্ত টাকা ও বিক্রীত মালের উপর আড়তের নিয়মানুযায়ী কমিশন্ কাটিয়া লইয়া বাকী টাকা ব্যাপারীকে ফেরত দিবেন। চেকের টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারিলে বা দিতে বিলম্ব হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহা ক্ষতির কারণ, ইহাতে টাকা দিতে বিলম্ব হইলেও কোন ক্ষতির কারণ নাই। আড়তদার-কোম্পানী ব্যাপারীকে অগ্রিম যত টাকা দিবে, ব্যাপারী-প্রদত্ত সে-পরিমাণ মাল, আড়তদারের গুদামে গচ্ছিত থাকিবে। কাজেই ইহাতে আড়তদারের টাকা নষ্ট হইবার কোন ভয় নাই। ব্যাঙ্কের পক্ষে এ জাতীয় কাজ সম্ভব হয় না। ব্যাঙ্ক বড় জোর মাল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে পারে; কিন্তু খরিদ্দারের মাল নিজেরা বিক্রয় করিয়া টাকা ওয়াশীল করিয়া লইতে পারে না। তারপর কলিকাতার বাহিরের যে-সকল ব্যাপারী থাকে, ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক তাহাদের কোন সাহায্য হয় না। কাজেই আড়তদারী ও ব্যাঙ্কের মধ্যে ঠিক তুলনা করা চলে না।

আড়তদার-কোম্পানী ও বাংলার মিল্

আড়তদার-কোম্পানী ইচ্ছা করিলে বাংলার শিশু-শিল্পগুলির (infant industries) সাহায্য কবিতে পারিবেন। বাংলায় যে-সমস্ত চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত কলে বৎসরে ৬ মাস মাত্র কাজ চলে। ইক্ষুব চাষ শেষ হইলে ঐ সমস্ত কলের আর কোন কাজ থাকে না। ৬ মাস কাজ করিয়া ১২ মাস বিক্রয়ের জন্য মাল মজুত রাখিতে হয়। কিন্তু ঐ সব কোম্পানীর তহবিলে এত প্রচুর টাকা থাকে না যে, তাহারা সমস্ত বৎসরের মাল প্রস্তুত করিয়া গুদাম ভর্ত্তি করিয়া রাখিতে পাবে। কাজেই কলওয়ালাদেব টাকা ধার করিবার প্রয়োজন হয়। এইজন্য অনেক 'মিল্' ব্যাঙ্কের নিকট মজুত মালের গুদাম বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া থাকে। পরে মিলের যখন যে-পরিমাণ মাল বিক্রয়ের খবিদ্দার সংগ্রহ হয়, ব্যাঙ্ক সেই পরিমাণ টাকা জমা লইয়া মাল 'ডেলিভাবী' দিয়া থাকে। অথবা 'মিল্' খরিদ্দারের নামে একটা বিল করিয়া ব্যাঙ্কেব নিকট পাঠাইয়া দেয়। ব্যাঙ্ক ঐ বিলের টাকা খরিদ্দারেব নিকট হইতে আদায় করিয়া উক্ত খরিদ্দারকে বিলের লিখিত পরিমাণ মাল ডেলিভারী দিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক মজুত মালেব গুদাম বন্ধক বাখিয়া সুদ পায়, তদুপরি খরিদ্দারের নিকট টাকা আদায়ের জন্যও একটা কমিশন পাইয়া থাকে।

আড়তদাব-কোম্পানীর যদি যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন থাকে, তবে ন্যায্য কমিশন প্রাপ্তির চুক্তিতে এইভাবে টাকা খাটাইয়া বেশ লাভ করিতে পারে। এইভাবে বাংলার যাবতীয় শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্য একমাত্র আড়তদার-কোম্পানীর দ্বারাই হইতে পারে। এই উপায়ে আড়তদার-কোম্পানী অতি অল্পকাল মধ্যেই যেমন যথেষ্ট উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারিবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা (backing) করিতে

পারিবে। যে ব্যবসায়ে প্রকৃতপক্ষে খরচ কম অথচ লাভ বেশী এবং নিশ্চিত, উপযুক্ত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে তাহার উন্নতি না হইবার কোন কারণ আমি দেখি না। চিনির কল, কাপড়ের কল, তেলের কল, প্রভৃতি যাবতীয় মেসীনারী কারবারে (machineries) মূলধনের অধিকাংশ টাকা প্রথমেই ব্যয় হইয়া যায়। পরে ব্যবসা চালাইয়া লাভ হইতে থাকিলে ঐ সমস্ত কল-কারখানার ব্যয় পূরণ হইয়া যদি অতিরিক্ত লাভ থাকে, তবেই 'শেয়ার-হোল্ডার'গণকে ডিভিডেণ্ড্ দেওয়া চলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আবার কলকব্জা মেরামত ও পরিবর্ত্তনের ব্যয় দরকার হইয়া পড়ে। এখানে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। ঐ সমস্ত কারবারের সূত্রপাতেই মূলধনের অর্দ্ধেক টাকা কলকব্জার মূল্য বাবদে আমেরিকা ও ইউরোপে পাঠাইয়া দিয়া তবে ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয়। চার পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধনের ব্যবসায়ে জনকতক কর্ম্মচারী ও শ্রমিক প্রতিপালিত হয় মাত্র। কিন্তু পরিকল্পিত এই আড়তদারী ব্যবসায়ের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান বাংলাদেশের যাহা প্রধান সমস্যা, তাহার অনেকটা সমাধান হইবে। তাহা ছাড়া এমন কয়েকটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালীজাতিকে ব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগশীল করিয়া তোলা যাইবে। ইহা হইতে কতকগুলি কম মাহিনার সাধারণ লোক কর্ম্মচারী হিসাবে প্রতিপালিত হইবে। কতকগুলি লোক ঐ সমস্ত ব্যপারীর মাল বিক্রয় করিয়া দালালী পাইবে। আর মাল আমদানী-রপ্তানির জন্য পশ্চিম দেশীয় কুলী না লইয়া বাংলা দেশ হইতে ঐ শ্রেণীর কতকগুলি লোক আমদানী করিয়া তাহাদের কাজ দেওয়া যাইবে।

জাপানী ও বিলাতী মাল

এই জাতীয় কোম্পানী যত বেশী হয়, ততই ভাল। কারণ কোন

কোম্পানী হয়তো বাংলার পল্লী-অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের আমদানী-করা মাল খরিদ-বিক্রয় করিবে। কোন কোম্পানী হয়তো বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্য করিবে এবং কোন কোম্পানী হয়তো পশ্চিম দেশীয় সরিষা, তিসি, কলাই প্রভৃতি মালের কাজ করিবে। এইভাবে ব্যবসার নানা ক্ষেত্র তৈরী করিয়া, উৎসাহ দিয়া ক্রমে ক্রমে যদি বাঙালীর ছেলেদের কাজে লাগানঁ যায়, তবে কিছু দিন পরে প্রতিযোগিতায় হটিয়া গিয়া অ-বাঙালীরা ব্যবসায়-কেন্দ্রে বাঙালীকে স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। পিছনে যদি একটা পৃষ্ঠপোষক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকে, তবে বাঙালীর ছেলেরা অনেক কাজ করিতে পারিবে, ইহা জোর করিয়াই বলা যায়। যে-সমস্ত জাপানী ও বিলাতী মাল অ-বাঙালীরা ব্যাঙ্কের মারফতে আমদানী করিয়া বাংলার দোকানদারদের নিকট বিক্রয় করে, এইরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান যদি বাংলার শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়কে ঐ সমস্ত কাজে সাহায্য করে, তাহারাও ঐ কাজ করিতে পারে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। জাপানী ও বিলাতী মাল ভারতে আমদানী হয় **ব্যাঙ্কের মারফতে**। যে-সমস্ত ব্যবসায়ীরা ভারতের বাহিরে মালের অর্ডার দেয়, তাহারা উক্ত মালের মূল্যের শতকরা ১০।১৫৲ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিয়া দেয়। বিদেশী ব্যবসায়ীরা উক্ত মাল জাহাজে প্রেরণ করিয়া তাহাদের **চালান** ব্যাঙ্কের নিকট প্রেরণ করে। ব্যাঙ্ক ঐ সকল মাল নিজেদের গুদামে মজুত রাখিয়া মাল-সরবরাহ-কারীকে উহার মূল্য মিটাইয়া দেয়। পরে ঐ ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কের নিকট যখন যে-পরিমাণ টাকা জমা দেয়, সেই পরিমাণ মাল 'ডেলিভারী' লইয়া বাজারে বিক্রয় করে। আড়তদারী প্রতিষ্ঠানও এইরূপ কাজ হাতে লইয়া যদি বাঙালীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, অবশ্যই তাহারাও ঐ কাজ করিতে সক্ষম হইবে এবং সু-পরিচালিত হইলে, এই ভাবে যে একটি ব্যাপক ব্যবসাক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঘৃত

অ-বাঙালীরা বাংলার বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত আমদানি করে। বাঙালীরাও ঐ কাজ করিতে সক্ষম। বাংলার যুবক-সম্প্রদা ঐ সমস্ত ঘৃত চালান করিলে যদি আড়তদার-কোম্পানী উক্ত মাল গুদামে মজুত রাখিয়া টাকা সরবরাহ করেন এবং তাহারা যখন যে-পরিমা টাকা প্রদান করিবে, সেই পরিমাণ মাল 'ডেলিভারী' দিতে থাকেন তাহা হইলে উক্ত ব্যবসায় অনায়াসেই বাঙালীর হাতে আসিবে বাংলায় যদি কতকগুলি আড়তদারী-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, তবে বাঙালী হাতে বহু বহু কাজ জুটিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বেকার-সমস্যার বহুল পরিমাণে সমাধান হইতে থাকিবে।

কৃষিজাত ফসলের দর নিয়ন্ত্রণের উপায়

বাংলায় যদি কতকগুলি বড় বড় লিমিটেড্ আড়তদারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, এবং বাংলার যুবক-সম্প্রদায়ের মাথায় যদি স্বার্থবুদ্ধি ও প্রতারণার কোন উদ্দেশ্য চাপিয়া না বসে, তাহা হইলে প্রত্যেক জেলার গ্রামাঞ্চলের বিশ্বস্ত উৎসাহী কর্ম্মী যুবকগণকে লইয়া উক্ত লিমিটেড্ আড়তদারী-কোম্পানীর অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ কারবার খোলা যাইতে পারে। এই জাতীয় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পল্লী-অঞ্চলের উৎপন্ন অধিকাংশ মালের বাজার-দর নিয়ন্ত্রণ (control) করা সম্ভব হইতে পারে। এই কাজে মূলধন সংগ্রহ করা অপেক্ষা চাষী-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অর্জ্জন করাই বেশী প্রয়োজন। বাংলার যে-সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাট, ধান, কলাই, মশুরী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তথাকার উৎসাহী কর্ম্মী যুবক-সম্প্রদায় যদি কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া নদী ও রেলষ্টেসনের ধারে গুদাম ভাড়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আড়ত খুলিয়া বসিতে পারেন, এবং চাষী-সম্প্রদায়ের উৎপন্ন সমস্ত মাল তাঁহারা বিক্রয় করিয়া দিবেন—এইরূপ প্রচার করিয়া সাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ক্রমশঃ সব মাল তাঁহাদের আয়ত্তাধীনে আসিবে। অবশ্য প্রথম প্রথম কেহই উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহিবেনা, হয়তো বা বিরুদ্ধ-প্রচারকারীও অনেক জুটিয়া যাইবে। কিন্তু স্থানীয় কতকগুলি লোকও যদি বুঝিতে পারে যে, ইহাদের উদ্দেশ্য সাধু, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাল বিক্রয় হইলে প্রবঞ্চনার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং বেশী লাভ হইবে, তখন আপনা হইতেই উহার সার্থকতা প্রচারিত হইয়া পড়িবে এবং জনসাধারণেরও

ইহার উপর নিঃসন্দেহ বিশ্বাস স্থাপিত হইবে। একবার যদি চাষীদের বিশ্বাস হইয়া যায়, আর প্রচারের (publicity) প্রয়োজন হইবে না।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ চাষীদের মাল লইয়া নৌকায় বা রেলে কলিকাতায় আড়তদার লিমিটেড্ কোম্পানীতে চালান করিবেন। তথায় উক্ত মাল বিক্রয় করিয়া নিজেরা প্রতি মণে ৴০ কিংবা ৶০ কমিশন কাটিয়া রাখিয়া বিক্রয়-লব্ধ অবশিষ্ট সমুদয় টাকা কৃষক-সম্প্রদায়কে পরিশোধ করিয়া দিবেন। উক্ত মাল ঘরে রাখিয়া বিক্রয় করিলে যদি কৃষকগণ ৫৲ টাকা দর পাইত, আর এই প্রতিষ্ঠানের মারফতে বিক্রয় হওয়ায় যদি ৫॥০ দর পায়, তাহাতে তাহারা লাভ মনে করিবে। ইহাতে ক্রমশঃ তাহারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। কৃষক-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে মাল লইবার সময় যাহার নিকট হইতে যে-পরিমাণ মাল লওয়া হইবে, ওজন ঠিক করিয়া দলিল স্বরূপ তাহাকে একটা হাতচিঠা লিখিয়া দিতে হইবে এবং প্রত্যেক কৃষকের মালে পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন (mark) দিয়া মাল চালান করিতে হইবে। নচেৎ একের প্রদত্ত মাল অন্যের মালের সহিত মিশিয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ সকলের মাল একই প্রকার (same quality) নহে। কাহারও মাল হয়তো কম দরে বিক্রয় হইবে, কাহারও বা বেশী দরে বিক্রয়ের সম্ভাবনা। এই কারবারে সব চেয়ে বড় কথাই হইল কৃষকের বিশ্বাস-অর্জ্জন। যতদিন কৃষক-সম্প্রদায় এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও সততা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত হইতে না পারিবে, ততদিন ইহাদের কোন সার্থকতা থাকিবে না। এই সমস্ত মাল চালান হইলে বিক্রয় হইয়া টাকা পাইতে কিছুদিন বিলম্ব হইতে পারে। তজ্জন্য হয়তো কোন কোন চাষীকে অগ্রিম কিছু কিছু টাকা প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠানের সব সময়েই কিছু মূলধন হাতে রাখা দরকার।

"আওতি সওদা" (Forward Contract)

ধনী অ-অবাঙালী ব্যবসায়ীরা পল্লী-অঞ্চলের বড় বড় মোকামে গদী গুদাম ভাড়া লইয়া, তাহাদের নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সাহায্যে পাট, ধান প্রভৃতি খরিদ করিয়া থাকে। উক্ত ব্যবসায়ীরা জুট্ মিল কিংবা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সহিত 'আওতি সওদার' (forward contract) চুক্তি গ্রহণ করে। উক্ত আওতি সওদার চুক্তিতে লিখিত থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্ধারিত দরে এত পরিমাণ মাল সরবরাহ করিতে হইবে। তাহা না পারিলে চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। এই প্রকার চুক্তিতে মাল বিক্রয় করিতে হইলে ক্রেতার নিকট মালের মূল্যের শতকরা ১০।১৫৲ ডিপোজিট্ রাখিতে হয়। যাহারা এই সমস্ত 'কন্ট্রাক্ট্" লয়, তাহারাই বাংলার বড় বড় মোকামে আড়ত খুলিয়া মাল খরিদ করে। মোকামে বসিয়া মাল খরিদ করিতে পারিলে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে মাল সংগ্রহ করা যায় বলিয়াই তাহারা মোকাম হইতে মাল কিনে, নতুবা কলিকাতার আড়তে আড়তে যে সমস্ত মাল আমদানি হয়, তাহাও তাহারা খরিদ করিতে পারিত, কিন্তু তাহাদের আশঙ্কা থাকে,—পাছে কলিকাতায় আমদানি মাল অধিক দরে খরিদ করিতে হয়, এবং পাছে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তির পরিমাণ মাল সংগ্রহ না হয়। তাহারা যে মফঃস্বলে গিয়া গদী-গুদাম ভাড়া লইয়া, লোকজনের মাহিনা দিয়া, মাল খরিদের জন্য এত টাকা ব্যয় করে, তাহার উদ্দেশ্যই হইল চাষীদের নিকট হইতে সস্তায় প্রয়োজনীয় মাল সংগ্রহ করা। কলিকাতায় বসিয়া তাহা সম্ভব হয় না। ফলে, যাহারা রৌদ্র, বর্ষা, শীতে প্রাণপাত করিয়া ফসল উৎপাদন করে, তাহারা কিছুই পায় না। ইহার লাভ ভোগ করে মধ্যশ্রেণী ব্যবসায়ী (middlemen) ও মিলওয়ালারা। মিল-

ওয়ালারা পাট হইতে প্রস্তুত জিনিষে শতকরা ৬০।৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে।

ধনী অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা যদি উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক মাল খরিদের কাজে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের 'আওতি সওদা' চুক্তির সর্ত্ত রক্ষার্থ দর বাড়াইয়াও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল খরিদ করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং হয় দরবৃদ্ধি করিয়া তাহারা চাষীদিগের নিকট হইতে সরাসরি মাল খরিদ করিবে, নয়তো উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সহিত একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া লইবে। এতদুভয়ের যে-কোনটিতে দেশের লোক অপেক্ষাকৃত বেশী লাভবান হইবে। বাংলার কৃষিজাত বহু বহু জিনিষ যাহারা শুধু নামমাত্র মূল্যে লইয়া যাইতেছে, এই জাতীয় বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক যদি তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা কম দরে 'আওতি সওদার' কণ্ট্রাক্ট লইতে আর সাহস করিবে না। অনেকে হয়তো বলিতে পারেন, কোটী কোটী টাকা লইয়া যে-সব ব্যবসায়ীর কারবার, এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গঠন দ্বারা তাহাদের কতটুকু বাধা দেওয়া যাইবে? উত্তর—সমষ্টিগত ক্ষুদ্র শক্তিও অনেক সময় প্রবল শক্তিকে বিব্রত করিয়া তুলিতে পারে। প্রচণ্ড শক্তিশালী পশুরাজ সিংহও যদি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা কর্ত্তৃক এক-সময়ে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দংশনের জ্বালায় তাহাকেও ছুটিয়া পলাইতে হয়।

বাঙালীর অদৃষ্ট-বাদিতা

বাংলায় কাজেরও অভাব নাই, টাকারও অভাব নাই—অভাব বিশ্বস্ত উৎসাহী কর্ম্মীর। যে-জাতি এত দিন পাথার নীচে হাওয়া

খাইয়া ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আফিসে কলম পিষিয়াছে এবং মাসান্তে বাঁধা মাহিনা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে এসব যে বিশেষ ঝঞ্ঝাটের কাজ মনে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা পরিশ্রমকে ভয় করে না, কর্ম্মে যাহাদের অফুরন্ত উৎসাহ, তাহারাই তাই হাজার হাজার মাইল দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আজ বাংলার সুখ শান্তি লুটিয়া লইতেছে, আর আমাদের বাঙালী বাবুরা ছুটিতেছেন জ্যোতিষীর বাড়ী। হস্তরেখা ও কোষ্ঠী বিচার করিয়া ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা জ্যোতিষী মহোদয় বলিয়া দিবেন—সুদিন আসিতে তাহাদের আর কত বাকী। স্বর্গ হইতে পাকা ফলটি কবে মাটিতে পড়িবে, আর তাহারা কুড়াইয়া লইবেন! এই যখন আমাদের মনোবৃত্তি, তখন অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের দোষ কি! আমরা একদিন যাহা ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহাই গ্রহণ করিয়া, বরণ করিয়া আজ তাহারা সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। আর আমরা যখন বরাবর ব্যবসায়ে বিমুখই ছিলাম, তখন এর, ওর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আর আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। ইচ্ছা করিয়াই যাহা পায়ে ঠেলিয়াছি, কোন উপায়ে তাহা পুনরুদ্ধার করা যায় কিনা ইহাই হইবে আমাদের এখন একমাত্র চিন্তা, এবং এই সমস্যার সমাধান করিতে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অর্থে কিছুই হইবে না। আমার পরিকল্পিত পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিশালী আড়তদারী-প্রতিষ্ঠান পিছনে দাঁড়াইয়া যদি এই জাতিকে ব্যবসামুখী করিবার সাহায্য করে, একমাত্র তাহা হইলেই ব্যবসায়ক্ষেত্রে অদূর-ভবিষ্যতে বাঙালী জাতি তাহার ন্যায্য স্থানটি আবার অধিকার করিতে পারিবে। বাঙালী বড় ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী—নিজ নিজ বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতেই এক মাত্র তাহার আনন্দ (Self-centred), তাই কোনও জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে আজও সে তাহার শক্তির পরিচয় দিতে পারিল না। এমন একটা বিরাট প্রতিভাশালী জাতির পক্ষে ইহা বড় লজ্জার

কথা—এ লজ্জা, এ কালিমা তাহাকে মুছিয়া ফেলিতেই হইবে। যে-কোন প্রতিষ্ঠান—ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, জাতির স্বার্থবিবেচনায় বাঙালী যদি ইহাকে দরদ দিয়া সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়, এ জাতির পুনরুত্থান হইতে দেরী লাগিবে না।

ইংরাজ-জাতির কয়েকটি লোক প্রথম ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসেন। তাঁহাদের একজন নবাবের কন্যাকে চিকিৎসা করেন। নবাব তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিতে চাহেন, কিন্তু তিনি উক্ত লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়া ভারতবর্ষে স্বজাতির ব্যবসায় করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া লন। ইহাই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত। যে-জাতির লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া জাতির কল্যাণের জন্য এত বড় ত্যাগ করিতে পারে, সে মহান্ জাতি পৃথিবী জুড়িয়া রাজত্ব করিবে না তো করিবে কি বাঙালী!

বাংলার জুট মিলওয়ালা এবং ভারতের বাহিরের মিলওয়ালাদিগের ব্যবসায় পরিচালনে আবশ্যকানুযায়ী পাট খরিদ করিতেই হইবে। বাংলার প্রতি জেলায় পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান যদি পেশাদার ব্যবসায়ীদের পাট-খরিদের ব্যাপারে কতকটা বাধা দিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা বুঝিবে যে, জাতির মধ্যে সাড়া আসিয়াছে—নিজেদের লাভের হার কমাইয়া কিছু অংশ ছাড়িয়া না দিলে আর চলিবে না। এতদিন যাহারা বাংলার উৎপন্ন পাট নামমাত্র মূল্যে খরিদ করিয়া অসম্ভব লাভ করিয়াছে, একটা বাস্তব বাধা সৃষ্টি করিতে না পারিলে, শুধু বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে বাজার দর-নিয়ন্ত্রনের আবেদন-নিবেদন জানাইয়া কোন ফল হইবে বলিয়া আমি মনে করিতে পারিনা। পাটের লাভ মধ্যশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা মিলওয়ালারাই বেশী ভোগ করিয়া থাকে। কারণ তাহারা জানে যে, পাটের খরিদ্দার একমাত্র তাহারাই এবং বাংলার নিরন্ন কৃষক-সম্প্রদায় উহা বিক্রয় না করিয়া

ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারিবেনা। সে-ক্ষমতাই যদি তাহাদের থাকিত, তবে আজ তাহাদের এত পরিশ্রম-লব্ধ ফসল নামমাত্র মূল্যে খরিদ করিয়া ধনী মিলওয়ালারা এত বেশী লাভ করিতে সক্ষম হইত না। কাজেই মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য একদিকে পাটের চাষ কতকটা সঙ্কোচ করা (restrict) যেমন দরকার, অপরদিকে ঐ জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গঠনে পেশাদার খরিদ্দারদের (middlemen) বাধা দেওয়াও দরকার।

কার্য্য-প্রণালী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অতি সামান্য মূলধন লইয়া কাজ করিতে হইবে, সুতরাং প্রচার-কার্য্যের দ্বারা কৃষক-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস উৎপাদন করাই হইবে ইহাদের লক্ষ্য। কারণ চাষীরা যদি এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ও সততায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাদের হাতে মাল ছাড়িয়া দিতে না পারে, তবে সমস্ত পরিকল্পনা বিফল হইবে। প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের চাষীদিগকে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তাহাদেরই হিতার্থে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান। এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া যদি কৃষক-সম্প্রদায়কে তাহারা আকৃষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহা-দিগকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার করা যাইতে পারে। আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান একদিন মস্ত হইয়া উঠিতে পারে। কৃষক-সম্প্রদায় যখন ইহাদের উপকারিতা বুঝিতে পারিবে, তখন নগদ টাকা না দিয়া জমীর উৎপন্ন ফসল প্রদানেই ইহার শেয়ার লইবে। কৃষক-সম্প্রদায়কে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করিতে পারিলে ইহার মূলধন বৃদ্ধি পাইবে ও ইহার সত্যিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের হাতে যথেষ্ট মূলধন আসিলে কৃষক-সম্প্রদায় মহাজনের নিকট উচ্চ সুদে যে-সমস্ত ঋণ গ্রহণ করে, তাহা এই সমস্ত

প্রতিষ্ঠানই দিতে পারিবে। অনেক স্থলে চাষী-সম্প্রদায় মহাজনের নিকট হইতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে একমণ ধান লইয়া পৌষ-মাঘ মাসে দেড়গুণ দিবে, এইরূপ চুক্তিতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কিছু ধান গোলাজাত করিয়া ঐ প্রকার ঋণও দিতে পারে।

এই জাতীয় পল্লী-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হইবে—(১) পাটের মরশুমে পাট খরিদ-বিক্রয় ও কৃষক-সম্প্রদায়ের পাট বিক্রয় করিয়া দিয়া প্রতি মণে ৵০—/০ হিসাবে কমিশন গ্রহণ ; (২) ধান্য এবং অন্যান্য ফসলের মরশুমেও মাল খরিদ করিয়া আড়তদার-কোম্পানীর নিকট চালান দিয়া বিক্রয় করা ; (৩) মরশুমে কিছু ধান্য গোলাজাত করিয়া কৃষক-সম্প্রদায়কে চাষের সময় ঋণ প্রদান। ইহাতে বার্ষিক যাহা লাভ হইবে, তাহার অর্দ্ধেক টাকা প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধির জন্য মজুত (reserve) রাখিতে হইবে। বাকী-অর্দ্ধেক কর্ত্তৃপক্ষগণের পারিশ্রমিক ও অংশীদারগণের ডিভিডেণ্ড্ প্রদান করিতে ব্যয় হইবে। এইরূপে বিশ্বস্তভাবে ২।৪ বৎসর কাজ করিতে পারিলে প্রতিষ্ঠান দাঁড়াইয়া যাইবে। কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন, কর্ম্মঠ ও বিশ্বস্ত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে যদি পরিচালিত না হয়, তবে এই পরিকল্পনা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে এবং ইহার ফল এত বিষময় ও সুদূর-প্রসারী হইবে যে, এ জাতি হয়তো ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আর কোনদিন দাঁড়াইতেই পারিবে না। বাঙ্গালী যদি তাহার অতিবুদ্ধি ও প্রতারণা-মনোবৃত্তি পরিহার করিতে পারে, তবে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারের ভিতর দিয়া জাতি একদিন বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু পশ্চাতে শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক আড়তদারী প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক।

ব্যবসায় করিতে হইলে কি কি গুণ থাকা দরকার

দিন দিন চাকুরী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, সাধারণ লোক আজকাল ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিয়াছে, ইহা অবশ্য শুভলক্ষণ। কিন্তু এজন্য কয়েকটি গুণ আয়ত্ত করা চাই। প্রথমেই ব্যবসার হিসাবপত্র রাখিতে শিক্ষা করা প্রয়োজন। হিসাবপত্র রাখিতে না জানিলে বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে ব্যবসায় করিয়া সফলকাম হওয়া সুকঠিন। ডিগ্রীধারী শিক্ষিত-সম্প্রদায় একথাটা মোটেই বুঝিতে চাহেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহই এই অন্ধ গর্ব্বের কারণ, সন্দেহ নাই। তাই দেখিতে পাই রীতিমত মূলধন ফেলিয়া ব্যবসা করিতে গিয়া অনেকে মূলধন হারাইয়াছেন। মালিক যদি হিসাবপত্র না বোঝেন, শুধু কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায় করা চলে না। হউক কর্ম্মচারী বিশ্বস্ত, ব্যবসার মালিক নিজে যদি হিসাবপত্র না বোঝেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বদাই কর্ম্মচারীর মুখাপেক্ষী হইয়া তাহার হাতের পুতুল-স্বরূপ থাকিতে হয়। তাহাতে সে কারবারে কোন প্রকার শৃঙ্খলতা থাকে না।

এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, অনেক ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া বিনা মূলধনে বা অতি সামান্য মূলধনে বেশ ভাল ব্যবসায় ফাদিয়া বসিয়াছেন। ইহা কিসে সম্ভব হয়? কারণ বড় ব্যবসায়ীর নিকট চাকুরী করিয়া, ব্যবসায় সম্বন্ধে তাহার বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় এবং সেই অভিজ্ঞতার ফলে বড় বড় মহাজন ও দালালের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া যায়। সেইজন্য ঐ সমস্ত লোক ব্যবসায় আরম্ভ করিলে,

ঐ সমস্ত মহাজন ও দালালের সাহায্যে বিনা মূলধনে বেশ উন্নতি করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে ব্যবসায়-শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান নাই। সুতরাং যাঁহারা ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কিছুদিন ঘরের খাইয়া পরের ব্যাগার দেওয়া উচিত। যদি সে সুবিধা সকলের না হয়, তবে অন্ততঃ কোন ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারীর নিকট কিছুদিন হিসাবপত্র রাখাটা শিক্ষা করিয়া লওয়া উচিত।

মহাজনের বিশ্বাস-অর্জ্জন

যিনি যে ব্যবসাই করুন, মহাজনের নিকট বিশ্বাস অর্জ্জন করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত। মহাজনের নিকট বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিলে শীঘ্রই ব্যবসার পশার ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীর Payment, অর্থাৎ টাকাকড়ি আদান প্রদানের উপরই মহাজনের বিশ্বাস নির্ভর করে। মহাজনের কর্ম্মচারী টাকার তাগাদায় আসিলে, যে-ব্যবসায়ী টাকা পরিশোধ করিতে বিলম্ব করে না, সেই ব্যবসায়ী স্বভাবতঃই মহাজনের বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হয়। এরূপ ব্যবসায়ীকে মহাজনেরা সর্ব্বদা সানন্দে সাহায্য করিয়া থাকে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের সুবিধা না থাকিলে, পাওনার কতকাংশ অন্ততঃ দেওয়া উচিত। কোন মহাজনকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার টাকা বুঝাইয়া দেওয়ার চুক্তি থাকিলে এবং সেই সময়ের মধ্যে কারবারের তহবিলে সম্পূর্ণ টাকা মজুত না থাকিলে, ধার করিয়াও প্রাপ্য টাকা শোধ করিতে হয়। তাহাতে কিছু সুদ দিতে হইলেও, সেজন্য পশ্চাৎপদ হইতে নাই। ইহাতে মহাজনের নিকট ব্যবসায়ীর পশার বৃদ্ধি পায়।

মহাজনের চালানে বা বিলে প্রাপ্য টাকার অঙ্কপাতে কোন ভুল হইলে, অর্থাৎ ভুল বশতঃ যদি ন্যায্য টাকার অঙ্ক কম হইয়া থাকে, তাহা

ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ মহাজনকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। ঐ ভুলের সুযোগ লইয়া খানিকটা লাভ করিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি থাকা ব্যবসায়ীর উচিত নহে। ইহাতে মহাজনের নিকট বিশ্বাসী হওয়া যায়। ব্যবসায়ে সাধুতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি।

ব্যবসায়ীর মন সরল ও উদার হওয়া আবশ্যক। যাহাদের মধ্যে সে গুণ না থাকে, তাহারা ব্যবসায় করিয়া উন্নতি করিলেও সুনাম লাভ করিতে পারে না। বাক্-চাতুর্য্যে বাহাদুরী প্রচার করিলে, তাহাতে ব্যবসায়ীর ক্ষতি ছাড়া পশার বৃদ্ধি পায় না। কার্য্যের সততায় ও ব্যবহারের মধুরতায় খরিদ্দারের মন যেরূপ আকর্ষণ করা যায়, বড় বড় বক্তৃতায় তাহা সম্ভব হয় না।

কথার মূল্য

ব্যবসাদারের কথার মূল্য খুব বেশী। যে-ব্যবসায়ী কথার মূল্য ঠিক রাখে না, খরিদ্দার বা মহাজন তার দিকে ঘেঁসিতে চায় না। দেনা-পাওনায় যেমন কথা ঠিক রাখা দরকার, কারবারেও তেমনি। কোন খরিদ্দারকে কোন জিনিস নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার পর, হঠাৎ যদি সেই জিনিসের দাম চড়িয়া যায়, তাহা হইলে দর চড়িয়া গিয়াছে বলিয়া খরিদ্দারকে সেই জিনিস প্রতিশ্রুত-দরে বিক্রয় করিতে আপত্তি করা মোটেই উচিত নহে। এমন কি, মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠার ভাব না আনিয়া, সরল মনে হাসিমুখে তাহা দেওয়া দেওয়া উচিত। খরিদ্দারের (customers) উন্নতিতে ব্যবসায়ীর সর্ব্বদা আনন্দবোধ করা উচিত। খরিদ্দার দু'পয়সা লাভ করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি করুক, প্রকৃত ব্যবসায়ীর ইহাই হইবে বাঞ্ছনীয়। যে ব্যবসায়ী খরিদ্দারকে শোষণ করিয়া কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিতে চায়, বাজারে তাহার সুনাম থাকে না। মোটকথা ব্যবসায়ী

মাত্রেরই খরিদ্দার ও মহাজন উভয় পক্ষেরই বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে না পারিলে উন্নতি ও পশার বৃদ্ধি পায় না।

ব্যবসার নামে জুয়াচুরি

বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর লোক দেখা যাইতেছে, যাহারা গোড়া হইতেই মহাজনদের ঠকাইবার সঙ্কল্প লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করে। তাহারা তাহাদের কারবারের এমন সব অদ্ভুত নাম দেয় যে, প্রয়োজনের বেলায় প্রকৃত মালিককে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঐ শ্রেণীর লোকেরা প্রথমতঃ কিছু মূলধন লইয়া কারবার খুলিয়া বসে, এবং যে-দরে মাল খরিদ করে, সেই দরে কিংবা তারও কম দরে খরিদ্দারকে মাল বিক্রয় করিয়া কাটতির পরিমাণ অসম্ভব বৃদ্ধি করিয়া, মহাজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মহাজনেরা মালের অত্যধিক কাটতি দেখিয়া তাহাকে বেশী পরিমাণ টাকার মাল ধার দেয়। পরে ঐ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা মহাজনের নিকট বেশী টাকার মাল ধার লইতে পারিলে, মালগুলি সস্তাদরে নগদ টাকায় বিক্রয় করিয়া কারবার বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়ে। ইহারা ব্যবসায়ী নহে,—জুয়াচোর। এই জাতীয় জুয়াচোরের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া মহাজনদের বিশ্বাস নষ্ট হওয়ায়, বর্ত্তমানে ভাল ব্যবসায়ী-দেরও বাজারে ধারে মাল খরিদ করা মুস্কিল হইয়া পড়িতেছে। কেহ কেহ পরিবারের কোন নাবালকের নাম দিয়া কারবার আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য, যদি উন্নতি হয় ভাল, আর যদি তাহা না হয়, তবে মহাজনেরা নালিশ করিয়া নাবালকের কিছুই করিতে পারিবে না। যেখানে গোড়াতেই এমন গলদ, সেখানে কখনই উন্নতি হয় না। "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"—একথা যে ব্যবসায়ে কত সত্য, খাঁটি ব্যবসায়ীমাত্রেই তাহা উপলব্ধি করেন।

মোটামুটি আইন-জ্ঞান

ব্যবসায়ীরা আইন-কানুনের বড় খবর রাখে না। এমন কি, বড় বড় মার্চেন্ট আফিস,—যাহাদের মাহিনা-করা আইনজ্ঞ থাকে, তাহারাও এজেন্ট্ বা খরিদ্দারের খরিদ-বিক্রয়ের সক্ষমতা (capability) দেখিয়া প্রচুর পরিমাণে ধার দিয়া থাকে, অত খুঁটিনাটি ভাবিতে বসে না। এ বিষয়ে তাহাদের চিন্তার ধারাই আলাদা। সাধারণ গৃহস্থ বা সুদখোর মহাজন সামান্য কিছু টাকাও যদি কাহাকে ধার দেয়, হ্যাণ্ডনোট্, বন্ধকী দলিল ছাড়া দেয় না—দিতে সাহসই পায় না। কিন্তু ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকার মাল শুধু মুখের কথায় ধার দিয়া থাকে। এমন কি, অনেক সময় রসিদ বা চালানে খরিদ্দারের স্বাক্ষরটি পর্য্যন্তও লওয়া হয় না। ব্যবসায়ীরা যে কত সরল-বিশ্বাসী, ইহার দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। এই জন্যই কোন ব্যবসায়ী খরিদ্দারের নামে পাওনা টাকার নালিশ রুজু করিতে উকিলের বাড়ী গিয়া প্রায়ই ধমক খাইয়া থাকে। কারণ অভিযোগ প্রমাণের জন্য আইনের দিক্ দিয়া যে-সমস্ত রসিদ-পত্রে খরিদ্দারের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক, অনেক সময় বিশ্বাসের উপর তাহারা তাহা কিছুই রাখেন না। এরূপ প্রায়ই দেখা যায়—একান্নবর্ত্তী পরিবারের তিন চার ভাই একসঙ্গে শুধু এক ভাইয়ের নাম দিয়া কারবার চালাইতেছেন। মহাজনেরা যদি টাকা আদায়ের জন্য সব ভ্রাতার নামে নালিশ করেন, তখন যাহার নামে কারবার তাহাকে ছাড়া আর বাকী ক'ভাই মহাজনকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে মামলায় সাফ জবাব দেন—উক্ত কারবারে তাহাদের কোন স্বার্থ ছিল না। উহা অমুক নম্বর প্রতিবাদীর নিজস্ব কারবার। তাহারা কখনই তাহাদের স্বার্থে উক্ত প্রতিবাদীকে কোন মহাজনের নিকট হইতে ধারে মাল আনিতে ক্ষমতা দেয় নাই ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পিতার কারবার পুত্র চালাইতেছে, এ অবস্থায় পিতার নামে পাওনা টাকার নালিশ হইলে, পিতা জবাব দেন,—"কারবার আমার পুত্রের। উক্ত কারবারে আমার পুত্রকে ধারে মাল দেওয়ার জন্য আমি কখনও কোন মহাজনকে চিঠি-পত্র দেই নাই বা আমার পুত্রকে সে ক্ষমতাও প্রদান করি নাই ইত্যাদি।" সুতরাং কারবারী লোকের কতকগুলি মোটামুটি আইন জানিয়া রাখা অতিশয় দরকার। কিন্তু ব্যবসায়ীরা স্বভাবতঃ এত সরল-বিশ্বাসী যে, কোন খরিদ্দারকে ধারে মাল বিক্রয় করিবার সময়, তাঁহাদের মনে এমন চিন্তাও আসে না যে, টাকা-আদায়ে কোন প্রকার বেগ পাইতে হইবে।

অকপটতা

পাওনাদার-মহাজনের সহিত খাঁটী ব্যবসায়ীর কদাচ কপট ব্যবহার করা উচিত নহে। ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মহাজনের দেনা শোধ করিতে অপারগ হইলে, দোকানের মালপত্র এবং খরিদ্দারের নিকট প্রাপ্য টাকা মহাজনকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়া যতদূর সম্ভব দেনা শোধ করা উচিত। মহাজনকে কখনই আদালতে যাওয়ার সুযোগ দিতে নাই। পাওনাদার মহাজন যদি বুঝিতে পারে যে, লোকটা সরল, ব্যবসায় করিতে গিয়া বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তখন তাহার উপর মহাজনের দয়া হয়। মহাজনগণ যদি দেনদারকে সত্য সত্য সরল লোক বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা হইলে অনেক সময় মহাজনেরা দেনদারকে বজায় রাখার জন্য সাহায্য করিয়া থাকে।

কোন ব্যবসায়ীরই হঠাৎ কারবার বন্ধ করা উচিত নহে। কারবার বন্ধ হইলে পাওনা টাকা আদায় হয় না। খরিদ্দারের নিকট পাওনা টাকা বাকী পড়িয়া থাকায় বা আদায় না হওয়ায় কারবারের মূলধনে যখন টানাটানি পড়ে, তখন ধার-বাকী বন্ধ করিয়া, পাওনা

আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে। এ অবস্থায় কারবারের খরচপত্র যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিতে হইবে। খরচপত্র কমাইতে না পারিলে আরও জড়িত হইয়া পড়িতে হয়।

"রিজার্ভ ফণ্ড"এর ব্যবস্থা

প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উচিত, কারবারে যখন লাভ হইতে থাকে, লাভের টাকার সিকি পরিমাণ কোম্পানীর কাগজে অথবা সেভিংব্যাঙ্কে পৃথকভাবে স্থায়ী আমানত রাখা। পারতপক্ষে সেই টাকা তুলিতে নাই। যদি কোন সময় কারবারে অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন উহার দ্বারা অসামান্য উপকার হয়। বড় বড় মার্চেন্ট আফিসের রীতি—তাহারা প্রতি বছরের মুনাফার টাকার কতকাংশ রিজার্ভ ফণ্ডে ঐভাবে মজুত রাখিয়া দেয়। কোন সময় ব্যবসার অবস্থা খারাপ হইলে, উক্ত টাকার সুদ হইতে অনায়াসে ব্যবসা বজায় রাখা যায়।

আমাদের বাঙালী ব্যবসায়ীদের এ সম্বন্ধে ধারনা কম—অনেকটা দূরদর্শিতারই অভাবে, সন্দেহ নাই। বাঙালী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় করিয়া যদি দু'পয়সা হাতে পায়, তবে হয় তাহার দ্বারা নূতন নূতন কারবার আরম্ভ করিয়া দেয় কিম্বা বাড়ী-ঘর-সম্পত্তি খরিদ করিয়া অন্যায়ভাবে টাকা আবদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে ব্যবসার সচ্ছলতা নষ্ট হয়।

যে-ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার বার্ষিক মুনাফার সিকি পরিমাণ টাকা যদি 'গবর্ণমেণ্ট পেপারে' রাখা যায়, এবং উক্ত টাকার সুদের দ্বারা যদি ব্যবসার ঘর ভাড়া, কর্ম্মচারীর বেতন প্রভৃতির কতকাংশ সঙ্কুলান হয়, তাহা হইলে একমাত্র অংশীদার-দিগের মনোমালিন্য ছাড়া সে ব্যবসায় নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কাই থাকে না।

কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন, "গবর্ণমেণ্ট পেপারের ওই সামান্য সুদে টাকাগুলি আটকাইয়া না রাখিয়া, উহা অন্য কোন লাভজনক ব্যবসায়ে খাটাইলে প্রচুর লাভ করা যায়।" তাঁহাদের এ যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন নহে, বরং সমীচীনই বটে। কিন্তু একটা কথা আছে। মূল ব্যবসাকে যদি একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান না যায়, তবে অনেক সময় অন্যান্য ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া হয়তো মূল ব্যবসাটিই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তারপর 'গবর্ণমেণ্ট পেপার' খরিদ করিলে টাকাটা ঠিক একেবারে আবদ্ধ হইয়াও থাকে না। ঐ 'পেপার' ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া যায়, অর্থাৎ উক্ত পেপার বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে সাময়িক টাকা লইবার ব্যবস্থা আছে। গবর্ণমেণ্ট পেপার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা একপক্ষে যেমন নিরাপদ, অপরপক্ষে তেমনি উহার দ্বারা সাময়িকভাবে টাকার অভাবও পূরণ করা চলে।

টাকার সচ্ছলতা

ব্যবসায়ীর টাকার সচ্ছলতা থাকা অতিশয় প্রয়োজন। টাকার সচ্ছলতা না থাকিলে, অনেক সময় অনেক সুযোগ তাহার নষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান দিনে যে-ব্যবসায়ীর যে-পরিমাণ টাকার সচ্ছলতা আছে, সেই ব্যবসায়ী সেই পরিমাণ লাভ করিয়া থাকে। মালের দরের সর্ব্বদাই ওঠা-পড়া হইয়া থাকে। পড়্তি বাজারে কম দরে মাল কিনিয়া মজুত রাখিতে না পারিলে, মোটা লাভ হয় না। তা'ছাড়া, কম দরে মাল খরিদ না থাকিলে অনেক সময় প্রতিবেশী ধনী ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় মাল বিক্রয় করিয়া খরিদ্দার ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে-ব্যবসায়ীর কম দরে মাল খরিদ থাকে, বাজার-দর চড়িয়া গেলেও, ঐ ব্যবসায়ী কখনই তখনকার বাজার-দরের সহিত

সমান পড়্‌তা দরে বিক্রয় করে না। সমব্যবসায়ী আর পাঁচজনের খরিদ্দার ভাঙ্গাইয়া লওয়ার জন্য কিছু কম দরে মাল বিক্রয় করিতে দেখা যায়। এইজন্যই কোন ধনী ব্যবসায়ীর পার্শ্বে সামান্য মূলধনে কেহ ব্যবসায় করিয়া লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এইজন্য যে-কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার সমস্ত অসুবিধাগুলি চিন্তা করিয়া তবে ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত।

বাঙালী ব্যবসায়ের স্বাদ পাইলে আজ পেটের দায়ে সামান্য চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইত না। ১৫৷২০৲ টাকার একটি চাকুরীর জন্য শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের যেরূপ ভীড় হয়, ব্যবসায়ে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিলে, তাহাবা ঐ সামান্য টাকার চাকুরীর জন্য ছুটাছুটি করিত না। ছোট ছোট ব্যবসায় করিয়াও এই টাকা উপার্জ্জন করিতে তাহারা সক্ষম হইত।

বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

বেকার-সমস্যা অল্প-বিস্তর সবদেশেই আজকাল ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বাংলায় এ সমস্যা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। ইহার আশু-সমাধান না হইলে আর চলিতেছে না।

কিন্তু এই বেকার-সমস্যার কারণ কি? বাংলায় লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়াই যে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে, তাহা হয়তো ষোল আনা সত্য নয়।

কুটীর শিল্প ও জাতীয় বৃত্তি ধ্বংস

একদিকে যেমন লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আবার দেশের মধ্যে অনেকগুলি শিল্প, ব্যবসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়া বহুলোকের কার্য্যলাভেরও (employment) সুযোগ মিলিয়াছে। তবে হয়তো যে-পরিমাণ লোক বাড়িয়াছে সে পরিমাণ কাজ নাই। তাহার উপর বাংলার কুটীর-শিল্প ধ্বংস হওয়ায় অনেক জাতির জীবিকার্জ্জনের উপায় নষ্ট হইয়াছে। কলের তেল আবিষ্কার ও আমদানী হইবার ফলে ঘানির ব্যবসায় একদম উঠিয়া গিয়াছে। ফলে তেলী-সম্প্রদায়ের বহুলোক বেকার হইয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে লোহার কারখানার প্রস্তুত কোদালি, কুড়ালি প্রভৃতি সাধারণ গৃহস্থের নিত্য-ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি আমদানীর ফলে কর্ম্মকারের ব্যবসা একরূপ লোপ পাইয়াছে। কাপড়ের মিল স্থাপিত হওয়ার ফলে, তাঁতি-জোলার হস্ত-চালিত তাঁত ধ্বংস হইয়াছে। এলুমিনিয়মের বাসন-আমদানীর ফলে দেশীয় পিত্তল-কাঁসার কারবার ও কারখানাগুলি লোপ পাইতে

বসিয়াছে, এবং ঐ কারণেই কুম্ভকারের ব্যবসায় অনেকটা ক্ষতি হইয়াছে। এইরূপ জাতীয় ব্যবসা ধ্বংসের ফলে, সকল-সম্প্রদায়ের লোকই নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে, তাই আজ বেকার-সমস্যা এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে **জাতীয় বৃত্তি বলিয়া আর কিছু নাই**। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ধোপার দোকান, জুতার দোকান খুলিয়া বসিতেছেন। বর্ত্তমানে সকল শ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষার আলোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে-সমস্ত লোক শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে, নিজেদের জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহারাও চাকুরীর বাজারে ভীড় জমাইয়া তুলিতেছে।

তথাকথিত সভ্যতা

যতদিন মানুষ নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিল, ততদিন অভাব-অভিযোগ এত বেশী ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে মানুষ যত শিক্ষিত ও সভ্য হইতেছে, তাহার দৈনিক অভাব-অভিযোগও সেই পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। সাধারণের আয়ের পথ এদিকে যত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, শিক্ষা ও তথা-কথিত সভ্যতা-বিস্তারের ফলে পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয় ওদিকে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। বেকার-সমস্যায় প্রপীড়িত সাধারণ লোকের এই দারুণ দুরবস্থা দর্শনে এক এক বার মনে হয়, দেশ যদি শিক্ষিত ও সভ্য না হইয়াও অন্নবস্ত্রের অভাব হইতে দূরে থাকিতে পারিত, এ শিক্ষা ও সভ্যতার বালাই না হয় নাই থাকিত।

আধুনিক শিক্ষা

এখানে যেন দেশবাসী আমাকে ভুল না বুঝেন। শিক্ষা যে খারাপ, একথা বলা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য

শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষা ভিন্ন কখনই কোন দেশ উন্নত হয় নাই। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা জীবন-সংগ্রামকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষা আমাদের সমস্যাই দিয়াছে, সমাধান দেয় নাই। অপরাপর দেশের লোক শিক্ষিত হইলে কাজের অভাবে এ রকম অনাহারে মরে না। আমাদের দেশে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের একমাত্র কেরাণীগিরি ছাড়া অন্য কোন সম্বল নাই। কিন্তু তাহাও আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিতের জন্য অন্য সমস্ত পথ রুদ্ধ থাকায়, আদালতে উকিলের ভীড় বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে তাহাতেও আর কাহারও অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিতেছে না। তাই ওকালতী-ব্যবসার মধ্যে আজকাল অনেক প্রতারণা ও অনাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ এক সময়ে এই ওকালতী ব্যবসাই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাতে অর্থ ছিল, সম্মান ছিল। কিন্তু এই ব্যবসায়ে এখন আর উপার্জ্জন নাই। অভাবের তাড়নায় অনেকের মনোবৃত্তিও কলুষিত হইয়া পড়িতেছে। অথচ যাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতৈষী, সর্ব্ববরেণ্য নেতা, তাঁহারা সকলেই আইন-ব্যবসায়ী। মহাত্মা গান্ধী, সি, আর, দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, জে, এম, সেনগুপ্ত, পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি অধিকাংশ বড় বড় নেতাই আইন-ব্যবসায়ী। পৃথিবীর সব দেশেই আইনজ্ঞগণের হাতে রাষ্ট্র-পরিচালনের ভার ন্যস্ত থাকে।

বাংলায় চুরি-ডাকাতির সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন? চুরি-ডাকাতির শাস্তি কি তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই, তথাপি লোকে চুরি-ডাকাতি করিতে যায় কেন? কারণ উদরের দাবী বড় নিদারুণ দাবী। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বাংলার রাজনৈতিক অসন্তুষ্টির (political discontent) মূলেও বেকার-সমস্যা। অন্ন-সমস্যার সমাধান হইলে, রাজনৈতিক আন্দোলনও যে মন্দীভূত হইবে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বোধ হয় স্বীকার করিবেন।

বেকার সমস্যা

বাংলায় বেকার-সমস্যা দিন দিনই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে না পারিয়া কেহ কেহ আত্মহত্যাও করিতেছে। ইহার আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে, 'বেকারের আত্মহত্যা' দৈনিক কাগজে নিত্য-নৈমিত্তিক খবর হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের হক্-মন্ত্রি-মণ্ডলী এদিকে কতটা সময় দিতে পারিতেছেন, জানি না। 'ডাল ভাতের' সমস্যাই আজি বড় সমস্যা—হক্ সাহেব যদি সে সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার কার্য্যকুশলতার পরিচয় হইবে! যতদিন বাংলার বেকার-সমস্যার সমাধান না হইবে, ততদিন গবর্ণমেণ্ট যতই কঠোরতা অবলম্বন করুন না কেন, দেশের অশান্তি দূরীভূত হইবে না।

ব্যবসায় শিক্ষা ও তাহার সময়

কয়েকজন জুনিয়র উকিল কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবসায় করিবেন স্থির করিয়া এই অভাজনের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম,—"দেখুন, আমার ধারণা 'বেমার্কা' না হইলে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। আপনারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মার্কাধারী, আপনারা কি এখন দাঁড়ীপাল্লা হাতে ধরিয়া ব্যবসায় করিতে পারিবেন?" উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, "আজ্ঞে, তা' সত্য। কিন্তু আমরা দাঁড়ীপাল্লার ব্যবসায় করিব না, ছাপাখানা খুলিব স্থির করিয়াছি। আমরা ৩।৪ জনে মিলিয়া যথেষ্ট অর্ডার সংগ্রহ করিতে পারিব, অনেকে বিশেষ ভরসাও দিয়াছেন। ছাপাখানার কাজে একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী ও জনকয়েক কম্পোজিটর রাখিলে বেশ ভালভাবে কাজ চলিয়া যাইবে। আমরা শুধু অর্ডার সংগ্রহ, বিল প্রস্তুত করা—এই সমস্ত কাজ করিব। ইহাতে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকার দরকার হইবে না, আদালতের কাজও আমাদের আটকাইবে না।" আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম "বুঝিয়াছি, রথ দেখা ও কদলী-বিক্রয়—দুই-ই আপনারা চান। তা' মন্দ নয়। কিন্তু দেখুন, ছাপাখানার ব্যবসা আপনারা যতটা সহজ বলিয়া মনে করিতেছেন, আমার বিশ্বাস তত সহজ নয়। আপনারা যদি ডিগ্রী লইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়া গোড়া হইতেই কম্পোজিটরী শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত আপনাদের ভরসা দিতাম, এবং আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে আমার নিকট আপনাদের পরামর্শ লইবারও আবশ্যক হইত না।

উহার সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়াই আপনারা ছাপাখানা খুলিতে পারিতেন। প্রথমেই বুঝিয়াছি, আপনাদের উদ্দেশ্য রথ দেখা ও কলা বেচা—দুই কাজ একসঙ্গে চালানো। ওকালতী-বিদ্যা ত আপনাদের হাতেই রহিল, তাহার উপর ছাপাখানার ব্যবসায়ে অতিরিক্ত আয় করিবেন, ব্যবসায় এত সহজ নহে।" কিয়ৎক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর আমার উহাতে সমর্থন নাই বুঝিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। খুব সন্তুষ্টচিত্তে যে যান নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, কয়েকদিন পরে উক্ত ছাপাখানার কাজ আরম্ভ হইল। আট নয় মাস পরে একদিন সংবাদ পাইলাম, আট হাজার টাকার প্রেস আট শত টাকায় বিক্রয় হইতেছে। উহার অনেক টাইপ্ এবং মেসিনের কোন কোন অংশ (parts) কম্পোজিটরগণ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তত্ত্বাবধায়ক উকিলবাবুরা আদালত হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে ছাপাখানার কাজকর্ম্ম পরিদর্শনে চা খাইয়া বাড়ী যাইতেন।

তথাকথিত শিক্ষা

যাহারা ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহ তাহাদের না পাইয়া বসিলেই ভাল হয়। ইহাতে খানিকটা সময় নষ্ট হয় মাত্র, তারপর একটুখানি অহমিকাও বাড়ে। কাজেই ব্যবসায়ের নিম্নস্তরের কাজ লইয়া আরম্ভ করিতে তাহারা লজ্জিত, সঙ্কুচিত হন। অথচ ব্যবসায় করিতে হইলে নিম্নস্তর হইতেই আরম্ভ করিতে হয়। যাহারা সেই শিক্ষা পায়, ব্যবসায়ে নামিয়া তাহারাই উন্নতি লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ প্রাপ্ত হইলে যুবকদের মধ্যে একটুখানি বিলাসিতা ও সম্মানবোধ বেশী জন্মে। অবশ্য বেকার-সমস্যার চাপে যুবক-সম্প্রদায়ের মন হইতে ঐ জাতীয় ভাব যেন অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, এবং বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামে তাহারা যে-কোন কাজ করিতে

ইতস্ততঃ করিতেছে না, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাব তাহাদের মনে এমনি একটা উচ্চাভিলাষ জাগাইয়া দেয়, যে পরবর্ত্তী জীবনে ছোটখাট ব্যবসায়ের মধ্যে তাহারা কোন প্রকার উৎসাহ ও আনন্দ পায় না। যাহারা অল্পশিক্ষিত এবং অল্পবয়স হইতেই ব্যবসায়ে শিক্ষালাভ করে, তাহাদের ভিতর ব্যবসায়ে দায়িত্ববোধ জন্মে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় উহার কিছুই নাই; কাজেই শিক্ষিত লোক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ সমস্ত চিন্তা ও দায়িত্বের কাজ তাহাদের ভাল লাগে না। এইজন্যই ব্যবসায় করা অপেক্ষা চাকুরী তাহাদের বেশী পছন্দ।

ব্যবসা শিক্ষার প্রশস্ত সময়

কথায় বলে "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাঁস টাঁস।" বস্তুতঃ বালকগণের কাঁচা প্রাণে গোড়া হইতে যে আদর্শের বীজ বপন করা যায়, অনুকূল আবহাওয়া পাইলে তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া জীবন-সংগ্রামে একদিন তাহাকে প্রেরণা দেয়। উচ্চশিক্ষার উপযোগী মেধাবী ছাত্রকেই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া উচিত। সাধারণ ছাত্রকে যে-কোন ব্যবসায়ীর নিকট কিংবা যে-কোন কারখানার কার্য্যে ব্যাগার খাটিতে দেওয়াও বরং ভাল। ইহাতে সময় নষ্ট ও অর্থব্যয় বাঁচিয়া যায়। অনেক ছাত্রকে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষার পর রেলওয়ে কিংবা গবর্ণমেণ্টের কোন কারখানায় (workshop) ঢুকাইতে চেষ্টা করা হয়, ইহাও চাকুরী পাইবার আশায়। কোন একটি কাজ শিখিয়া নিজে ব্যবসায় করিবে, এ উদ্দেশ্য বা চেষ্টা কাহারও দেখা যায় না; সকলেই চায় চাকুরী। যে-সমস্ত ছাত্র স্কুলে ফেল করে, 'অপদার্থ' ছাড়া 'পদার্থশীল' বলিয়া যাহারা কোনদিন সুখ্যাতি পায় নাই—দেখা যায়, ব্যবসায়ে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারাই একদিন বেশ উন্নতি করে। অল্প বয়স, দায়িত্বহীন

অবিবাহিত জীবন, ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষার পক্ষে জীবনের ঐ প্রশস্ত সময়। হাতে কলমে কাজ শিখিয়া দস্তুরমত যাহারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কারবার আরম্ভ করে, ভাগ্য-লক্ষ্মী তাহাদের অকৃপা করিতে বড় দেখা যায় না।

বেলগাছিয়ায় কালিপদ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যবসায়ী প্রথম-জীবনে তারিণীচরণ সাধুখাঁর তেলের কারবারে চাকুরী করিতেন। ১২৲ টাকা ছিল তাঁহার মাহিনা। কয়েক বৎসর পরে বেলগাছিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ৺রাইচরণ সাধুখাঁ মহাশয়ের মূলধনের সাহায্যে চারি আনা অংশীদার হিসাবে তিনি পাইকারী মুদিখানা কারবার আরম্ভ করেন। উহাতে তিনি বড় বড় মহাজন ও দালালের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া পড়েন। পরে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাত্র ১৪০০৲ টাকা মূলধনে নিজেই পৃথক্‌ভাবে কারবার আরম্ভ করিয়া ৪।৫ বৎসরের মধ্যে ৫০।৬০ হাজার টাকার ব্যবসায় চালাইতেছেন। এই প্রকারের আরও বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। কি ইউরোপে, কি আমাদের দেশে যে-সমস্ত লোক ব্যবসায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের পাঠ্য-জীবন অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছিলেন না, এবং তাঁহারা সকলেই প্রায় প্রথম জীবন হইতেই ব্যবসায়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু যখন বিলাতে 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের' সদস্য ছিলেন, তখন তাঁহার জনৈক সহকর্ম্মীকে (ইনি কোন বড় ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন) একটী বাঙালী যুবককে ব্যাঙ্কের কাজে শিক্ষানবিশ লইতে অনুরোধ করেন। সহকর্ম্মী ব্যক্তিটি যখন জানিতে পারিলেন যে যুবকটি গ্রাজুয়েট্ এবং তাহার বয়স ২২ বৎসর, তখন মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তরুণ বন্ধু, তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অপব্যয় করিয়াছ, এবং আমার আশঙ্কা হয়, ব্যাঙ্কের কাজ

শেখা তোমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা গ্রাম্য স্কুলের পাশকরা ১৫ বৎসর বয়সের ছেলেদের ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিশ লইয়া থাকি। তাহারা ঘরে ঝাড়ু দেয়, টেবিল-চেয়ার পরিষ্কার করে, সেই সঙ্গে হিসাব রাখিতে ও খাতাপত্র লিখিতে শিখে, এবং এইরূপে তাহারা ক্রমে ব্যাঙ্কের কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া দায়িত্বপূর্ণ পদ পায়।" (আত্ম-জীবনী পি, সি রায় ২৮১ পৃঃ)

কি করিয়া ব্যবসায় শিখিলাম

এইখানে একটুখানি আমার নিজের ব্যবসায় শিক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে চাই। বিন্দুমাত্র 'আত্ম-শ্লাঘা' যদি আমার লেখায় প্রকাশ পায়, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন—তাহা একান্ত অনিচ্ছাকৃত। আমি ১৩ বৎসর বয়সে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এনট্রান্স স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে লেখাপড়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। পাঠ্য-জীবনে আমি অবশ্য ফেল্ করা ছাত্র ছিলাম না। বাধ্য হইয়া লেখাপড়া ছাড়িতে না হইলে হয়তো এতদিনে আমি কোন আফিসের কেরাণী-গিরি কিংবা কোন আদালতে ওকালতীর ভীড় বৃদ্ধি করিতাম। আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, রোগগ্রস্ত হইয়া লেখাপড়া ত্যাগ করা আমার পক্ষে শাপে বর হইয়াছিল। এই দুরারোগ্য ব্যাধি আমি একাদিক্রমে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভোগ করি, এবং এখনো পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত নহি। আমার ঐ অস্থিব্রণ রোগ লইয়াই আমি মধ্যম ভ্রাতার দোকানের কাজকর্ম্ম দেখিতাম, কিন্তু তিনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। আমি চুরি না করিয়া কারবারের খাতায় আমার নামে খরচ লিখিয়া আবশ্যকানুযায়ী ২।১৲ টাকা লইতাম। ইহাতে মাসে ৩।৪৲ টাকাও হইত না। কিন্তু আমার মধ্যম ভ্রাতার স্বভাব, কেহ যদি দৈনিক ৫৲ টাকাও চুরি

করে, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি টাকাও লইবার উপায় ছিল না। ইহাতে বিরক্ত হইয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া শ্যামবাজার খালধারে বোস্ কোম্পানির কাঠের গোলায় প্রথমে শিক্ষানবিশী, পরে ১০৲ টাকা মাহিনায় চাকুরী করি। তখন আমার ১৮।১৯ বৎসর বয়স। আমি যেখানে চাকুরী করিতাম, সেখানে খাতা লেখা, হিসাবপত্র রাখা ইত্যাদি শিক্ষার কোন সুবিধা ছিল না। কাঠগোলার মালিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় অন্যত্র চাকুরী করিতেন। তিনজন কর্ম্মচারীর মধ্যে আমারই ছিল সর্ব্বোচ্চ পদ, অথচ কি প্রকারে ব্যবসায়ীর খাতা লিখিতে হয়, তাহা আমি জানিতাম না। আমাদের পার্শ্বেই সমব্যবসায়ীর আর একটি কারবার ছিল; তথায় ইতিনা (যশোহর) নিবাসী ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক সুযোগ্য কর্ম্মক্ষম কর্ম্মচারী কাজ করিতেন। তিনি ছিলেন যার-পর নাই সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। হিসাব লেখা লইয়া আমি যখনি যে মুস্কিলে পড়িতাম, তিনি পরম যত্ন ও আগ্রহের সহিত আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। ব্যবসায়ের খাতা লেখা, হিসাব রাখা প্রভৃতি সম্বন্ধে ক্ষীরোদ বাবু আমার গুরু। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

কেরোসিনের এজেন্সী গ্রহণ

আমি এক দিকে কাঠগোলায় চাকুরী করিতাম, অপরদিকে সমস্ত সহরময় ঘুরিয়া ব্যবসায়ের অনুসন্ধান লইতাম। এমনি সময়ে ইণ্ডোবার্ম্মা পেট্রোলিয়ম কোম্পানির আফিসে সংবাদ পাইলাম যে, দু'হাজার টাকা ডিপোজিট্ দিলে কেরোসিন তেলের এজেন্সী পাওয়া যায়। কিন্তু টাকা কোথায়? দেশে গিয়া ভ্রাতাদের সহিত একযোগে দলিল দিয়া মহাজন-গণের নিকট টাকা ধার পাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কেহই টাকা

দিতে রাজী হইলেন না। হতাশ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। শেষে আমার কাঠগোলার মনিব নরেনবাবুকে ধরিলাম। তিনি অতি সৎপ্রকৃতির লোক, আমাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এবং বিশ্বাসও করিতেন খুব। তিনি নিজেই উক্ত দু'হাজার টাকা আমার নামে জমা দিয়া বড়দলে (খুলনা) কেরোসিন এজেন্সী লইলেন। ঐ এজেন্সী বখরাদারীতে (partnership) চলিবে এইরূপ স্থির হয়। প্রথম ৫।৬ মাস ব্যবসা ভাল চলে নাই। কারণ, কোথায়ও এজেন্সী হইলে স্থানীয় দোকানদারগণের অসুবিধা। দোকানদারগণ কেহই মাল লইবে না—সিদ্ধান্ত করিয়া একজোট্ হইয়া কমিটী করে। আমি কিছু কমিশন ছাড়িয়া দিয়া কৌশলে উক্ত কমিটী হইতে ২।৩ জন দোকানদারকে ভাঙ্গাইয়া লইলাম। তাহাতে অন্যান্য সকলে মনে করিল, "তাইতো, ইহারা কয়েকজন সুবিধা ভোগ করিতেছে, আমরা কেন তবে লোকসান করিতেছি।" তখন সকলেই আমার নিকট হইতে মাল লইতে আরম্ভ করিল। ব্যবসায়ও একপ্রকার ভালই চলিতে লাগিল। কিন্তু মফঃস্বল হইতে টীন-বস্তা ভর্ত্তি করিয়া রেল ও ষ্টীমারযোগে কাঁচা টাকা, রেজকী, কলিকাতায় আমদানী হইতে দেখিয়া আমার কলিকাতাবাসী মনিব ভীত হইয়া পড়িলেন—কি জানি যদি কোন সময় কলিকাতায় আসিবার পথে উক্ত টাকা চোর-ডাকাত কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এজন্য তাঁহারা উক্ত ব্যবসায়-ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। আমি বড় চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। চল্‌তি ব্যবসায় ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া ভারী দুঃখ হইল। আমি আবার দেশে চলিয়া গেলাম। এবার অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। বুঝিলাম ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেশের মধ্যে আমার একটু নাম প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই মহাজনেরা দু'হাজার টাকার দলিল লইয়া টাকা

দিতে আর ইতস্ততঃ করিলেন না। উক্ত টাকা আমার মনিবদের ফেরত দিয়া আমি একাই ব্যবসায় চালাইতে লাগিলাম। আজও সে ব্যবসা আমার হাতে—তবে তাহার পরিসর বাড়িয়াছে। সে যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় বাবু নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর সাহায্য না পাইলে হয়তো উক্ত এজেন্সী আমার লওয়া হইত না। কাজেই, তিনি যে আমার পথ-প্রদর্শক এবং সাহায্যকারী তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এজন্ত আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী।

আমি যে-প্রকার ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ব্যবসায়ে উত্থান-পতনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও আমার আছে। ব্যবসায়ে নামিয়া অনেকবার অনেক টাকা লোকসানও দিয়াছি। একবার একখানি লবণের বোট গঙ্গায় ডুবিয়া যায়, তাহাতে ৫৪০০৲ টাকা লোকসান হয়, কিন্তু সেজন্য আমি ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই। অথচ সে সময় আমার মূলধনও বেশী ছিল না।

সততার অগ্নি-পরীক্ষা

আমার ব্যবসায়-জীবনে ভগবান একটি বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়াছিলেন, উহা লোভ-সংবরণ। পাওনাদারকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রবঞ্চিত করিয়া নিজের স্বার্থসাধনকে আমি কোনদিনই বড় করি নাই। আমার জীবনে উহার বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেই সব পরীক্ষার পর হইতে আমি ব্যবসায়ের উন্নতি বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি।

পাওনাদারদিগের প্রাপ্য টাকা নির্দ্ধারিত সময়ে পরিশোধ করা ছিল আমার ব্যবসায়ের মূলনীতি। এজন্য যদি সুদে টাকা ধার লইতে হইত, তাহাও করিতাম। ইহার পুরস্কারস্বরূপ, অতি অল্পদিনেই

আমার উপর লোকের বিশ্বাস স্থাপিত হয়, এবং এজন্যই অনেকে আমার নিকট অনেক টাকা গোপনে গচ্ছিত রাখিতেন। এমন কি, সেজন্য কেহ আমার নিকট কোন রসিদ পর্য্যন্ত লইতেন না। এইভাবে চারিজন লোকের ৩৬২০০৲ টাকা আমার নিকট এক সময় গচ্ছিত থাকে। উহাদের মধ্যে দুইজনের মৃত্যু হয়। এই দুইজনের ১৪,২০০৲ টাকা আমার নিকট ছিল। একজনের স্ত্রী-পুত্র ছিল না, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। এই টাকা সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের কেহ কোন সংবাদ রাখিত না। প্রথমবারে যখন আমার নিকট এইরূপ ১৮,০০০৲ টাকা ছিল, তখন আমার নিজের মূলধন মাত্র ২৭০০৲ টাকা। আমার জনৈক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দেন যে, আমি স্বেচ্ছায় ঐ টাকা না দিলে উহা কেহ আদায় করিতে পারিবে না, মামলা-মোকদ্দমায়ও আমার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইবে না। বন্ধুর পরামর্শ প্রথমটা আমাকে ভাবাইয়া তুলিল—মনের মধ্যে দুইদিন পর্য্যন্ত আমার সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। কিন্তু আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, এই ১৮ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিলে, এখন লোকে আমাকে যেপ্রকার বিশ্বাস করে, এপ্রকার বিশ্বাস আর করিবে না—মনে মনে ঘৃণা করিবে। অতি সামান্য দিন ব্যবসায়ে আমি ২৭০০৲ টাকা মূলধন সঞ্চয় করিয়াছি, ভাগ্যলক্ষ্মী কৃপা করিলে একদিন আমার লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে। এই ১৮ হাজার টাকার মায়ায় সমস্ত জীবনটাকে কলঙ্কিত করা কখনই ঠিক হইবে না। যেমনি এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল, আমি কাল-বিলম্ব না করিয়া পরদিনই সমুদয় টাকা পরিশোধ করিয়া দিলাম। মাথা হইতে যেন একটা গুরুভার নামিয়া গেল। এতদিন মনে মনে যে অস্বস্তি ও গ্লানি অনুভব করিতেছিলাম, তাহা আর রহিল না।

প্রথমবারের ১৮ হাজার টাকার লোভ যখন এমনি সংবরণ করিতে সক্ষম হইলাম, তারপর একজনের ১২ হাজার টাকা, একজনের ৪ হাজার

ও অন্য একজনের ২২০০৲ টাকা পরিশোধ করিতে আমার মনে ইতস্ততঃ ভাব পর্য্যন্ত আসে নাই। কারণ, ঐ সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া ছিল। মৃত ব্যক্তিদিগের ঐ সমস্ত টাকা তাহাদের উত্তরাধিকারিগণকে ডাকিয়া আনিয়াই ফেরৎ দিয়াছিলাম। ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা সকলেই এক্ষণে জীবিত আছেন। তাহাদের নাম-ধাম প্রকাশ করিয়া এবং যে-ভাবে উক্ত টাকা আমার হাতে আসিয়াছিল, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। সমস্ত কথা লিখিতে হইলে আমাকে ৪০০ শত পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি আত্মজীবনী লিখিতে হয়।

ত্যাগেই আনন্দ

প্রবঞ্চনা বা বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে উপার্জ্জিত অর্থে সাময়িক উন্নতি হইলেও উহাতে মনের তৃপ্তি নাই। এ সংসারে ত্যাগ ভিন্ন প্রকৃত সুখ-শান্তি নাই। নিজের মন পবিত্র রাখিয়া চলিলে ভগবান কাহাকেও দুঃখ দেন না, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে দেবতা ও অসুর বর্ত্তমান। আমাদের অন্তর-জগতে সর্ব্বদাই এই দেবাসুরের মহাযুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধে কখনও দেবতার জয়, কখনও বা অসুরের জয় হইতেছে। দেবতার জয়ে শান্তি ও পবিত্রতা,—অসুরের জয়ে দুঃখ, দুর্ণাম, কষ্ট, অশান্তি। এই মহাযুদ্ধে যখন দেবতা জয়ী হন, তখনই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ।

মানুষ অবস্থার অধীন, একথা সত্য, কিন্তু মানুষের ভিতরে আবার এমন এক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা মানুষ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে পারে। যে-পরিমাণে মানুষের ঐ শক্তির বিকাশ হয়, সেই পরিমাণে মানুষ অবস্থার অধীনতা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। আমি ব্যক্তিগত জীবনে ইহা বহুবার উপলব্ধি করিয়াছি।

বাঙালীর গলদ

আমি এখানে বাঙালীর গলদ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিব। 'বাঙালীর গলদ'—তাহার অর্থ আমাদের নিজেদেরই পাপ-পুণ্যের কাহিনী। 'পুণ্য' কথাটি অবশ্য গৌরবে বহুবচনের মতই ব্যবহার করিলাম, আসলে ইহা আমাদের পাপেরই কাহিনী—লজ্জারই কাহিনী। ইহার উপর আলোক-সম্পাত না করিলেই হয়তো ভাল ছিল। তবু যে পাঁক ঘাটিলাম তাহার তাৎপর্য্য আছে। আশা করি, আমার দেশবাসী সে তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

গত ১৯২৬ সালে যখন আমি বার্ম্মাশেল অয়েল কোং-র অধীনে কলিকাতায় কেরোসিনের এজেণ্ট্ নিযুক্ত হইলাম, তখন বাজারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, যে-সমস্ত খরিদ্দার আমাদের কেরোসিন বিক্রয় করে, তাহাদের সবই হিন্দুস্থানী খোট্টা। তাহারা দেশ হইতে লোটা-কম্বল মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসিয়া একখানি ঘরভাড়া করিয়া আমাদের নিকট ধারে মাল লইয়া ব্যবসা চালাইতেছে। ইহাতে আমার মাথায় এক খেয়াল চাপিল—তাইতো, এই সমস্ত ব্যবসায়ে বেকার বাঙালী যুবক সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করিলে তো তাহারা মাসে অন্ততঃ ২৫।৩০৲ টাকা অনায়াসে রোজগার করিতে পারে। সুতরাং আমি অগ্রণী হইয়া আমার পরিচিত কয়েকটি ও দেশের কয়েকটি যুবককে উৎসাহিত করিয়া এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলাম। কয়েক মাস পরে দেখা গেল, ৮।১০টি দোকানের মধ্যে মাত্র একটি ছাড়া আর বাকী সব ক'টি আমার প্রদত্ত মূলধন নষ্ট করিয়া পাত্তাড়ি গুটাইয়াছে—মালিকদের কেহ পলাইয়াছে, কেহ বা পলাইবার চেষ্টায় আছে।

অথচ এই সমস্ত বাঙালীর ছেলেকে প্রতিপালন করিতে গিয়া আমার ১২।১৩ শত টাকা নষ্ট হইয়া গেল। বাঙালীর মধ্যে যিনি এখনো উহাতে টিকিয়া আছেন, তিনি এই ব্যবসা করার পূর্ব্বে অনেক ব্যবসায়ীর নিকট চাকুরী করিয়া একাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কাজেই কি ভাবে এই ব্যবসা চালাইতে হয়, তাহা তাঁহার জানা ছিল। অন্যান্য যতগুলি দোকান ফেল হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধানে বুঝিলাম, কেহ এমন সব ফাঁকিবাজ খরিদ্দারকে মাল বিক্রয় করিয়াছে, যাহারা ধারে মাল লইয়া কাহাকেও টাকা দেয় না। কেহ বা ব্যবসা আরম্ভ করিয়াই, হোটেলের খাওয়া রুচিকর নয় বলিয়া পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাসা বাঁধিয়াছেন। কেহ দোকান খুলিয়াই দেশের সংসার প্রতিপালনের ভার ঘাড়ে লইয়া মহাজনের টাকার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ আমার মত আরও ৩।৪ জন এজেণ্টের মাল ধারে লইয়া, যখন ২।১ হাজার টাকা পুঁজি হাতে আসিয়াছে, তাহা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। কেহ রাতারাতি বড়লোক হইবার আশায় জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িয়া নোট্ ডবল করিতে গিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন।

ফাঁকিবাজী

কলিকাতার মত ব্যবসা-বহুল স্থানে ধারে মাল লইয়া মহাজনকে ফাঁকি দিবার অজস্র সুযোগ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহারা মহাজনকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করে, তাহারা কারবারের এমন সব অদ্ভুত নাম দেয় যে, পরে মালিক খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে "এস মরেন এণ্ড কোং" নামক একটি কেরোসিনের দোকান ছিল। দেখিলাম, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বা তৎকালীন

এজেণ্ট্‌গণ ঐ কারবারে সকলেই ধারে মাল দিয়াছেন। আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে কারবারের প্রকৃত মালিককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ মশাই, আপনার কারবারের নাম 'এস মরেন কোং' কেন?" তিনি বলিলেন, "নাম সমরেন দত্ত, তাই ঐ নাম দিয়াছি।" কিছুদিন পরে যখন তিনি আমার প্রদত্ত ৬০০৲ ও অন্যান্য এজেণ্টগণের পাঁচ হাজার টাকা লইয়া একদিন কারবার বন্ধ করিলেন, তখন অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এস, মোরেন তাঁহার এক নাবালক পুত্রের নাম। তাঁহার নাম হইতেছে, চারুচন্দ্র দত্ত। যাক্, চারুবাবুকে তো ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আর পাওয়া গেল না। কিন্তু আমরা যারা ধার দিয়াছি—আমাদের চিন্তার ধারাটা কিরূপ ছিল? আমরা কেবল খরিদ্দারের (customer) মাল-কাটতির ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছি, আর এমন সোণার চাঁদ খরিদ্দার হয় না মনে করিয়া ধারে মাল ছাড়িয়াছি। কিন্তু কারবারের যে গোড়ায় গলদ ছিল, তাহা আমাদের কাহারও লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। সুতরাং ঘরের টাকা খুয়াইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

আগেই বলিয়াছি—বাঙালী যে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে না, তাহার একমাত্র কারণ তাহারা শ্রমকাতর, অলস ও অসাধু। একটুখানি লেখাপড়া শিখিয়াই তাহারা মনে করে, তাহারা জানে না এমন কিছুই নাই—একেবারে সবজান্তা তারা। এজন্য কোন কাজে শিক্ষানবিশী করিতে নারাজ। মানিয়া লইলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিলে মূর্খ দুর্ণাম ঘুচিতে পারে, কেরাণীগিরি চাকুরীর দরখাস্তে উপাধির ফিরিস্তি দেওয়া চলে। কিন্তু একমাত্র পাঠ্য পুস্তকের বিদ্যা ছাড়া আর কোন অভিজ্ঞতা তার মধ্যে থাকে কি? যে-শিক্ষায়

পেটের ভাতের সংস্থান হয় না, পরনের কাপড় জুটে না—শুধু কেবল খানিকটা মিথ্যা অভিমানবোধ (false sense of prestige) সৃষ্টি হয় ; যে শিক্ষায় কোন নিম্নস্তরের কাজ করিতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, শ্রমের মর্য্যাদাকে উচ্চ আসন দেয় না, সে শিক্ষা আমি কিছুতেই বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারিনা। জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী যাহাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নাই, তাহারাও নিজ নিজ আহার নিজেরা যোগাড় করিয়া থাকে। আর বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ বাঙালী শুধু উদরান্ন সংস্থানের জন্য পরমুখাপেক্ষী। এদিকে আমাদের জীবন-যাত্রায় আড়ম্বর বাড়িতেছে, অন্যদিকে অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইতেছে। ইহাতে বাঙালীর অস্তিত্ব লোপ পাইতে আর বিলম্ব কি! প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই আমাদের চা চাই ; অনেকের আবার প্রায় সমস্ত দিনই ইহা চলে। তৎপরে সিগারেট্, ম্যাচ, টুথ পাউডার, ব্রাশ্, সেফ্টী রজার্স, পোষাক-পরিচ্ছদ, আরও কত কি! কিন্তু জীবনযাত্রার এই সব সরঞ্জামের মধ্যে কোন্‌টা আমাদের দেশে আমাদের নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত? আমরা দেশে টাকা সৃষ্টি করিতে জানি না, অথচ বিদেশীর অন্ধ অনুকরণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন স্থানে টাকা প্রেরণ করিতেছি। আমাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত উকিল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণি, তাঁহারা আমাদের দেশের ধনী ও সম্পত্তিশালী লোকের টাকা ভাগবাটোয়ারা করিয়া নিজেরা অর্থশালী হইয়া বিলাস-ব্যসনে জীবনযাপন করেন। যে মোটরগাড়ী চড়িয়া আমরা বিলাসিতায় জীবনযাপন করি, তাহার সম্পূর্ণ টাকাই আমাদের বিদেশে চলিয়া যায়। যে পোষাক-পরিচ্ছদে আমরা বাবুগিরি করি, তাহার চৌদ্দ আনাই যায় বিদেশে ; দু'আনা যাহা থাকে তাও অবাঙালীরা পায়। বাঙালী প্রতিনিয়ত ইহা চোখের উপর দেখিতেছে, তবু তাহারা অন্ধ হইয়াই আছে।

হুজুগ-প্রিয়তা

যখন বিদেশী সিগারেট বয়কট্ আন্দোলন হইল, তখন বাঙালীর বিড়ি ব্যবহারে আপত্তি ছিল না। ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং-র এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, সত্বর তাহাদের এদেশ হইতে কারবার গুটাইতে হইত। আমিও সে সময় উক্ত কোম্পানীর একজন এজেণ্ট ছিলাম। বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়িতে আমি উক্ত এজেন্সি পরিত্যাগ করিলাম। কোম্পানীর সাহেব উহা পরিত্যাগ করিতে আমাকে বারবার নিষেধ করিয়াছিল। সাহেব আমাকে বুঝাইয়াছিল, "মিষ্টার বোস্! তুমি এজেন্সি ছাড়িও না; বাঙালীর এই হুজুগ বেশী দিন থাকিবে না, পরে কিন্তু ঠকিবে।" আমি সাহেবের সে কথায় কাণ দিলাম না—এজেন্সী ছাড়িয়া দিলাম। পরে উহা আমারই দেশের জনৈক লোক লইলেন। কিছুদিন পরে সত্যসত্যই দেখা গেল আমার আমলে যেখানে মাসিক ১০।১২ হাজার টাকা বিক্রয় হইত, সেখানে ১৫।১৬ হাজার টাকা বিক্রয় হইতেছে। যাঁহারা সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা আবার সিগারেট্ ধরিলেন কেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "সকলেই যখন ধরিয়াছে, আমি একজন ছাড়িলেই আর লাভ কি?" বাংলায় যখন যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, দেখিতে পাই বাঙালীরা তাহাতে এমনভাবে মাতিয়া ওঠে যে, দেশ বুঝি একদিনেই স্বাধীন হইয়া যায়। কিন্তু ৬ মাসের বেশী সে ভাবপ্রবণতা কখনই স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। বাঙালীর দ্বারা সমষ্টিগত (joint) কোন কাজ চলে না, কারণ সকলেই পণ্ডিত। যদি কাহারও প্রস্তাব গ্রাহ্য না হইল, অমনি তিনি রুষ্ট হইলেন। ফলে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। দেশের উন্নতির দিক্ হইতে সাধারণ-প্রতিষ্ঠানে এ জাতীয় পাণ্ডিত্য

প্রদর্শন করিতে যাওয়া যে কত বড় ভুল, বাঙালী তাহা কোন দিন বোঝে নাই, বুঝিবে কিনা সন্দেহ। মুসলমান জাতির ভিতর এখনও কিছু কিছু একতা দেখা যায়, কারণ তাঁহারা সকলেই এখনও পণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। আর কিছুদিন পরে অবশ্য তাঁহারাও যে হিন্দুর অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনুকরণের নেশা

বাঙালীর ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন কিছু নাই। অন্যে যাহা করিতেছে, তাঁহারা সেই আদর্শই অনুসরণ করেন। কিন্তু অন্যের ঐ আদর্শ ভাল কি মন্দ সে বিচার কেহ করেন না। একজন সিগারেট্‌ খাইতেছে অতএব আর একজন তাহা খাইবে না কেন, ইহাই যাহাদের যুক্তি, সে জাতির দ্বারা আর কি আশা করা যাইতে পারে? একজন ধনী তাঁহার পুত্র-কন্যার বিবাহে পোলাও, কালিয়া খাওয়াইয়াছে বলিয়া গরীবের ভিটামাটি বন্ধক দিয়াও সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে না পারিলে, যে জাতির আত্ম-সম্মান নষ্ট হয়, সে জাতির উদ্ধারের উপায় কি? আমার দেশবাসী জনৈক দরিদ্র গৃহস্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও ও গ্রামবাসীর অর্থ-সাহায্যে তাঁহার কন্যার বিবাহে বরযাত্র ও নিমন্ত্রিতবর্গকে পোলাও খাওয়াইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে প্রশ্ন করায়, তিনি বলিলেন যে, সাহায্যকারীরা কেহ চাল, কেহ ঘি, কেহ মাছ দিয়াছেন, কাজেই বাধ্য হইয়াই ঐ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ব্যাপার যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার মতে ভদ্রলোকের চাউল ঘি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা হাত করা উচিত ছিল।

বস্তুতঃ সামাজিক প্রথা ও ভুয়া মান-মর্য্যাদার খাতিরে, আমি জানি, বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাঙ্গালী পরিবারও অনেক সময়ে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে। এখানেও আমি বলিব, বাঙালীর স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বেরই অভাব।

জাগো বাঙালী

বাংলায় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার কাপড় মন্দ নহে, দামও বেশী নয়। হয়তো প্রতি জোড়ায় দুই এক পয়সা বেশী হ'তে পারে। বাঙালীরা যদি ব্যক্তিগতভাবেও এই সমস্ত মিলের কাপড় খরিদ করে, তা হলে বাংলার মিলগুলি অচিরে উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু বাঙালীর সে মনোবৃত্তি কোথায়? ইহা আমি অনেক কাপড়ের দোকানে বসিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি। যে জাতির নিজের সংসারে কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, দেশের টাকা দেশে রাখিতে সামান্য ত্যাগ ও সহানুভূতি নাই, বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাবুগিরি করিতে যাহারা লজ্জিত বোধ করে না, সেই যুবক-সম্প্রদায় কি বাংলার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল? আচার্য্য পি, সি, রায় তাঁহার "অন্ন সমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার" পুস্তকে এ সম্বন্ধে বহু পরিশ্রমে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ, দেশহিতৈষী লোকের কথায়ই যখন আমাদের যুবক-সম্প্রদায়ের সাড়া মিলিল না তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি—আমার কথা কোথায় মিলাইয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই।

বাঙালীর যৌথ-ব্যবসায়

আমি এই প্রবন্ধে যৌথ-ব্যবসায়ের পরিচালন-নীতির ত্রুটিগুলিই দেখাইব মাত্র। অর্থ-নৈতিক ভিত্তিতে (from the standpoint of Economics) আলোচনা করিব না, কারণ তাহা আমার উদ্দেশ্য নয়।

যৌথ-ব্যবসায় দুই প্রকার—বখ্‌রাদারী এবং লিমিটেড্‌ কোম্পানী। একাধিক অংশীদারের মূলধন লইয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তাহাকে বলে "বখ্‌রাদারী ব্যবসায়"। আর কোম্পানী রেজিষ্টারী করতঃ শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তাহার নাম হয় লিমিটেড্‌ কোম্পানী।

গোড়ায় গলদ

এই উভয় প্রকারের ব্যবসায়েই বাঙালী উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি দেখাইতে পারে নাই। শিক্ষিত-সম্প্রদায় সাধারণতঃ লিমিটেড্‌ কোম্পানীই করেন—বখ্‌রাদারী করেন না, করিলেও তাহা বেশীদিন স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। বরং যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের দুই একটি বখ্‌রাদারী কারবার স্থায়িভাবে চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অংশীদারগণের যার যার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মনোভাব লইয়া বখ্‌রাদারী ব্যবসায় পরিচালিত হইলে কখনই তাহার উন্নতি সম্ভবপর হয় না। প্রথমতঃ দেখা যায় বখরাদারী কারবারের অংশীদারগণ যে-সব নিয়ম-প্রতিপালনের অঙ্গীকারে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিছুদিন পরে আর তাহা বজায় থাকে না। কারবারের

তহবিল হইতে সকলেই ইচ্ছামত খরচ করিতে থাকেন; অংশীদারদের মধ্যে যদি কাহারও ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি থাকে, চক্ষুলজ্জায় তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না। আবার মুখ ফুটিয়া বলিলেও কোন কোন স্থলে তাহাতে পরস্পরের মনোমালিন্যের সূচনা হইয়া পড়ে।

অনেক সময় অনেক ফার্শ্মে দেখা যায় যে, অংশীদারদিগের পরস্পরের বক্তব্য কর্ম্মচারীর দ্বারা একজন অপরকে জানাইয়া থাকেন। চতুর কর্ম্মচারী ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া, হয় কোন ক্ষমতাশালী কিংবা কোন নির্ব্বোধ মনিবের পক্ষাবলম্বনে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া তোলে। আরও দেখা যায়, ফার্শ্মের কোনও কর্ম্মচারী কোন অংশীদারের আত্মীয় কিংবা প্রিয়পাত্র হইলে, তাহার কার্য্যের ত্রুটি বা অবহেলায় অন্যান্য অংশীদারদের বাধ্য হইয়াই চোখ বুজিয়া থাকিতে হয়। এই সমস্ত কারণে যৌথ-কারবারে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

এরূপও দেখা যায়, যৌথ-কারবারে বেশ দু'পয়সা লাভ হইতেছে দেখা গেলে অনেক অংশীদারের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। চতুর অংশীদার অন্য অংশীদারকে কারবার হইতে সরাইয়া দিয়া সমগ্র লাভ নিজে ভোগ করিবার লালসায় নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করে, এমন কি সুযোগ বুঝিয়া কারবার হইতে টাকা আত্মসাৎ করিতেও ছাড়েন না; কাহাকে লাভের বখ্‌রা দিতে প্রাণে বড় কষ্ট অনুভব করেন।

একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে বখ্‌রাদারী কারবার থাকিলে যিনি উহার পরিচালক, তিনি অন্যান্য অংশীদারের চোখে ধূলি দিয়া নিজে নানা প্রকারে কারবারের টাকা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কেহ কোন কথা বলিলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়া কারবার নষ্ট হইয়া যায়। অন্যান্য সহোদর ভ্রাতাদের পথে বসাইয়া, তাহাদেরই

একজন পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত তো সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার অনেক যৌথ-কারবারে পরস্পর পরস্পরকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে এমন মামলা-মোকদ্দমার জাল সৃষ্টি হইয়া যায়, যে কারবারের মূলধন, এমন কি শেষে অংশীদারদের ভিটামাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া সকলেই পথে দাঁড়ায়। এই সমস্ত কারণে অংশীদারের সংখ্যা বেশী হইলে প্রাইভেট লিমিটেড্ কোং গঠনে কারবার পরিচালন করাই অনেকটা নিরাপদ। এরূপ ক্ষেত্রে অংশীদারগণের পরস্পরের এমন মনোভাব দেখা যায় যে, নিজে ধ্বংস হইব সেও ভাল, তবু অন্য কাহাকে ভোগ করিতে দিব না।

উপায়-নির্দ্দেশ

অংশীদারগণের মধ্যে কোন প্রকার মতদ্বৈধ ঘটিলে, কিংবা তাঁহাদের কাহারও কার্য্যে অপর কাহারও কোন প্রকার সন্দেহের কারণ থাকিলে, পরস্পর খোলাখুলি আলোচনায় উহার মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। তাহা না করিয়া মনের মধ্যে সন্দেহ ভাব পোষণ করিয়া রাখিলে, পরস্পরের প্রতি অনাস্থা আসিয়া পড়ে। আর অনাস্থা জন্মিয়া গেলে সাধারণতঃই ব্যবসায়ের উপব অংশীদারগণের মমতা-বোধও কমিয়া যায়। ফলে অচিরেই ভাঙ্গাভাঙ্গির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

কারবার-সংক্রান্ত কোন গূঢ় আলোচনা সাধারণ কর্ম্মচারীদের সাক্ষাতে না হওয়াই উচিত। খুব বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইলে আলাদা কথা, নতুবা অংশীদারগণের পরিকল্পনা ও কারবার-পরিচালন-সংক্রান্ত নীতি কোন কর্ম্মচারীকে জানিতে দেওয়া ভাল নয়। যে-কারণেই হউক অংশীদারগণের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে তাহা নিজেদের ছাড়া অন্য কোন লোকের সাক্ষাতে আলোচনা করা উচিত নয়, তাহাতে কারবারের

পশার নষ্ট হয়। এক কারবারের কর্ম্মচারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য কোন সমব্যবসায়ীর নিকট চাকুরী গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারী তাহার নূতন মনিবের ব্যবসায়ের নীতি, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া দেয়। অনেক সময় নূতন ব্যবসায়ী পুরাতন ব্যবসায়ীর নিপুণ কর্ম্মঠ কর্ম্মচারীকে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া ভাঙ্গাইয়া লয়। তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারী পুরাতন মনিবের খরিদ্দার ভাঙ্গাইয়া নূতন মনিবের কারবার জমকাইয়া তোলে। কর্ম্মচারীদের মধ্যে নেমকহারামের সংখ্যাই অধিক।

বখরাদারী কারবারে কার্য্য-পরিচালন-সংক্রান্ত ব্যাপার একজনের উপর ন্যস্ত রাখিয়া তাঁহাকে কারবারের সভাপতি হিসাবে গণ্য করা উচিত। নতুবা সকলে সমান কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিলে ও কর্ম্মচারীদের উপর প্রভুত্ব চালাইতে গেলে শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। সভাপতির উপর কারবারের সমস্ত পরিচালন-ভার ন্যস্ত হইলেও, যদি কখনও কোন সমস্যা উপস্থিত হয়, সভাপতি অন্যান্য সমস্ত অংশীদারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সমাধান করিবেন। অংশীদারগণের পরস্পরের মন এত সরল হওয়া দরকার যে, যখনই কাহারও উপর কোন সন্দেহ জাগিবে, বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া তৎক্ষণাৎ খোলাখুলি আলোচনা করিয়া মনের সে গোলমাল দূর করিয়া লওয়া উচিত।

কর্ম্মচারী পরিচালনা

যৌথ-ব্যবসায়ে মনোমত অংশীদার-নির্ব্বাচন বড় কঠিন সমস্যা। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, বাল্যকাল হইতে পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু এমন ব্যক্তিরাও একসঙ্গে কারবার করিতে গিয়া পরস্পরের বন্ধুত্ব হারাইয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহার একমাত্র কারণ চক্ষুলজ্জা ও সরলতার অভাব।

অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ ব্যক্তিগতভাবে কোন কর্ম্মচারীকে কোনপ্রকার সুবিধা বা প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না। তাহাতে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মনে হিংসাভাবের (jealousy) সৃষ্টি হইয়া কারবারে বিশৃঙ্খলা আনিতে পারে। যোগ্যতাসম্পন্ন, কর্ম্মঠ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে তাহার কার্য্যের জন্য পুরস্কার কিংবা বেতন বাড়াইয়া দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু তাহাকে অন্যান্য কর্ম্মচারীর উপর প্রভুত্ব করিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। অবশ্য যদি উক্ত কর্ম্মচারী কারবারের ম্যানেজার হন তবে স্বতন্ত্র কথা।

অনেক সময় এক ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী সমব্যবসায়ী অন্য একজনের সহিত তাহাদের মনিবের কারবার-পরিচালন-নীতি সম্বন্ধে গল্প করিয়া থাকে। অনেক ফার্ম্মের তাগাদাকারী কর্ম্মচারীরা (Bill-collectors) খরিদ্দারের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজনে কখনও কখনও টাকা হাওলাত লইয়া থাকে। এই উপকারের প্রত্যুপকারে তাহারা উক্ত খরিদ্দারের নিকট মনিবের প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে অযথা বিলম্ব করে। ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীরা খরিদ্দারের নিকট হইতে পূজার সময় কিংবা চৈত্রমাসে পার্ব্বণী আদায় করিয়া থাকে। জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণেরও এইভাবে বেশ কিছু উপরি পাওনা হয়। জমিদারের প্রাপ্য টাকার জন্য কোন দেনদারের সম্পত্তি নীলাম-বিক্রয় হইতে থাকিলে কর্ম্মচারীরা দেনদারের নিকট দু'পয়সা লইয়া সময় প্রদান করিয়া থাকে। এমন কি, কৈফিয়ত দেওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে অনেক স্থলে নীলাম খারিজ করিয়াও দেয়।

বড় বড় মার্চ্চেণ্ট্ আফিসে অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বী (rival) কোম্পানীর রীতিমত মাহিনা-করা গোয়েন্দা (Informer) থাকে। তাহারা নিজের আফিসের সংবাদ অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আফিসকে দেয়। মোটর-কোম্পানীগুলিতেই এই জাতীয় গোয়েন্দার সংখ্যা বেশী।

কোন মোটর কোম্পানীতে যদি কোন খরিদ্দার গাড়ী দেখিতে যায়, তৎক্ষণাৎ এই সব গোয়েন্দা কর্ম্মচারী টেলিফোনে খরিদ্দারের নাম-ঠিকানা অপর কোম্পানীকে জানাইয়া দেয়। সেই কোম্পানী সংবাদ পাওয়া মাত্র তাহাদের দালাল বা প্রতিনিধিকে উক্ত খরিদ্দারের বাড়ীতে প্রেরণ করে।

এই সমস্ত কারণে কর্ম্মচারীদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করায় মুস্কিল আছে। যৌথ-ব্যবসায়ের মালিকগণ যাহাতে কান কর্ম্মচারীর প্রভাবে পড়িয়া অন্য অংশীদারের প্রতি সন্দিহান হইয়া না পড়েন, সেজন্য বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। সত্যই যদি অংশীদারগণের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার গোলমাল বা সন্দেহের কারণ ঘটে, কদাচ তাহা কোন কর্ম্মচারীকে জানিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে ঘটনাটি অতিরঞ্জিত হইয়া পরিণামে বিষময় ফল প্রসব করে। অংশীদারগণ যদি পরস্পরের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনায় সন্দেহ দূর করিয়া লইতে না পারেন, তাহাদের বখ্‌রাদারী ব্যবসায়ে নামা কখনই উচিত নহে। মনে রাখিতে হইবে, অংশীদারগণের পরস্পর বিশ্বাস ও প্রীতির উপরই যৌথ-কারবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

মন-ভাঙ্গাভাঙ্গির কারণ

যৌথকারবারের অংশীদারগণের মধ্যে কেহ যদি নিজের পুত্র বা কোন আত্মীয়ের দ্বারা পৃথক্‌ভাবে সেই কারবারই আরম্ভ করেন, তাহাতে অংশীদারগণের মন-ভাঙ্গাভাঙ্গির কারণ ঘটে। আরও যদি কোন অংশীদার কারবারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ব্যক্তিগতভাবে কিছু লাভ করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে নিজ নামে কিংবা বেনামে উক্ত কারবার সম্পর্কীয় কোন মাল চড়া বাজারে বিক্রী করিয়া লাভ করিবার আশায় বায়না করিয়া রাখেন, এবং উক্ত মালের বাজার-

দর সত্য সত্য চড়িয়া গেলে উহা বিক্রয় করিয়া নিজে লাভ করিয়া লন, কিন্তু যদি আবার উহার মূল্য হ্রাস হইয়া লোকসানের আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন আবার উহা কারবারের জন্য খরিদ করা ছিল বলিয়া হিসাবের খাতায় জমা খরচ লেখাইয়া দেন, তাহা হইলেও মনান্তর ঘটে। এইরূপ কপটতামূলক আচরণে কতিপয় যৌথ কারবার নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে।

আবার অপর অংশীদারগণের কোন মতামত না লইয়া যদি কোন একজন মালিক তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের উপকারার্থে অনেক টাকার মাল ধার দেন এবং যদি সে টাকা অনাদায় হেতু কারবারের লোকসান হয়, তাহাতেও অন্যান্য অংশীদারের মন ভাঙ্গিয়া যায়। এই কারণেও কয়েকটি বড় বড় যৌথ ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে।

যৌথ-কারবার অনেক সময়েই কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হয়। কারবারের আরম্ভের দিকে মালিকদের যতটা উত্তম দেখা যায়, ক্রমেই তাতে ভাটা পড়িতে থাকে। কোন অংশীদারের ভুলে যদি কোন খরিদ-মালে লোকসান হইয়া যায়, তাহাতে অংশীদার-গণ অসন্তুষ্ট হয়। অনেক সময় তাহাতেও মন-ভাঙ্গাভাঙ্গির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সদুদ্দেশ্যে-প্রণোদিত হইয়া কাজ করার ফলে এরূপ ঘটিলে লোকসানের জন্য অসন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত। উচিত, এইজন্য অংশীদারগণের পরস্পর পরামর্শ করিয়া কাজ করা। যিনি অন্যের সহিত কোনপ্রকার যুক্তি-পরামর্শ না করিয়া নিজের খাম-খেয়াল মাফিক কাজ করেন, তাঁহাকে অনেক সময় ঠকিতে হয়। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহিত যুক্তি করিয়া কাজ করিলে তাহাতে অনেক সময় ভুলের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার পরোক্ষ (indirect) একটা সুফলও আছে। মনিবের এইপ্রকার যুক্তি-পরামর্শের জন্য উক্ত কর্ম্মচারীর একটা দায়িত্ববোধ জন্মে। যেখানে প্রভুর আদেশ পালন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য, সেখানে কর্ম্মচারীর দায়িত্বজ্ঞানের বিকাশ হয় না। তাহাতে

স্বভাবতঃই কোনপ্রকার আন্তরিকতাও থাকে না।

পরিচালন-প্রণালী

বুদ্ধিমান অংশীদার লইয়া ব্যবসায় করা অনেকটা সহজ। কিন্তু যে-অংশীদার নিজে কাজ বুঝে না, পরের পরামর্শ অনুযায়ী চলে, তাহাদের লইয়া যৌথ-কারবার পরিচালন বড়ই মুস্কিল।

যৌথ কারবারের খাতা-পত্র এমন পরিষ্কার থাকা দরকার যে, মালিকগণ ইচ্ছা করিলেই যেন তাহাদের দেনা-পাওনা আয়-ব্যয় সর্ব্বদা বুঝিয়া লইতে পারেন।

যৌথ-কারবার পরিচালনে কতিপয় বিধিবদ্ধ নিয়ম থাকা দরকার। অংশীদার প্রত্যেকে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে মাসোহারা লইবেন। যদি কাহারও কোন সময় অতিরিক্ত টাকা লওয়ার দরকার হয়, অংশীদার-গণের মত লইয়া তাহা করা উচিত। তিনি নিজেও কারবারের একজন মালিক বলিয়া, অন্য অংশীদারের মত লওয়া অনাবশ্যক মনে করিলে চলিবে না। অংশীদারগণের কাহারও নিজের আত্মীয়-স্বজনকে কারবারের কর্ম্মচারী হিসাবে না লওয়াই উচিত। যদিই কাহাকে প্রতিপালন করিবার দরকার হইয়া পড়ে, তবে অন্যান্য অংশীদারের মত লইয়া তাহাকে নিযুক্ত করা উচিত এবং সেই আত্মীয়-কর্ম্মচারীর কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণের ভার নিজের হাতে না রাখিয়া অপর অংশীদারদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যৌথ-কারবারের অংশীদারগণের সর্ব্বদা এরূপ বিবেচনার সঙ্গে চলিতে হইবে, যাহাতে পরস্পরের কার্য্যে ও ব্যবহারে পরস্পরের লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ না থাকিতে পারে।

পুঁজি সরবরাহকারী (Capitalist Partner)

কোন কোন যৌথ-ব্যবসায়ে দেখা যায় কেহ মূলধন দিয়াছেন—কেহ শুধু ভাল ব্যবসা-পরিচালক হিসাবে বখরাদার হইয়াছেন।

ইংরাজিতে প্রথমটাকে বলে Capitalist Partner, অর্থাৎ পুঁজি-সরবরাহকারী অংশীদার, শেষোক্তটাকে বলে Working Partner, অর্থাৎ কার্য্য-পরিচালক হিসাবে অংশীদার। ইহাতে একজনের টাকা, এবং অন্যের ব্যবসাবুদ্ধি ও পরিশ্রম—এতদুভয়ের সমবায়ে কারবার পরিচালিত হইয়া থাকে। যিনি মূলধন দেন, তিনি এইজন্য কারবার হইতে নির্দ্দিষ্টহারে একটা সুদ পান। অবশিষ্ট মুনাফার টাকা অংশীদারগণের নির্দ্ধারিত অংশমত বাঁটোয়ারা হয়। মাড়োয়ারী কারবার মাত্রেই এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত। বাঙালীর অনেক ব্যবসায়ে এ প্রকার সুদের প্রথা থাকে না।

আবার অনেক যৌথ-কারবারে এই প্রকার নিয়মও প্রচলিত আছে, যে-ধনী অংশীদার কারবারের জন্য প্রথম একটা নির্দ্দিষ্ট মূলধন দেন, যদি কোন সময় তদতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত ধনী অংশীদার তাহার একটা সুদ নির্দ্ধারণ করিয়া আবশ্যকানুযায়ী টাকা কারবারে ধার দিয়া থাকেন।

নিয়ম ও সর্ত্ত

যৌথ-কারবার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত নিয়ম ও সর্ত্ত ঠিক করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত। নতুবা গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

(১) যৌথ কারবার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অংশীদারগণের অংশ ও মূলধনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

(২) উক্ত কারবারে যদি কোন শুধু বখরাদার (Working partner) থাকেন, তাঁহার অংশ স্থির করিতে হইবে।

(৩) পুঁজি-সরবরাহকারী অংশীদারগণ মূলধনের টাকার সুদ লইবেন কিনা? যদি লন, তবে সুদের হার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) শূন্য বখরাদার (Working Partner) যত টাকা হিসাবে মাসোহারা লইবেন, উক্ত টাকা তাঁহার বার্ষিক লভ্যাংশ হইতে বাদ যাইবে।

(৫) বার্ষিক মুনাফার টাকা হইতে শতকরা ১৫৷২০৲ টাকা অনাদায়ী ফণ্ডে (Reserve for doubtful.debts) জমা রাখা উচিত। নতুবা শূন্য বখরদার তাঁহার অংশের মুনাফার টাকা খরচ করিয়া ফেলিলে, যদি কোন বৎসরে কারবারে লোকসান হয়, তাহাতে Capitalist partner-এর লোকসান হইবে। শূন্য বখরাদারের নিকট ঐ টাকা আদায়ের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

(৬) পুঁজি-সরবরাহকারী অংশীদারেরা কারবার হইতে মাসিক কোন মাসোহারা লইবেন কিনা? এই প্রকারের খরচ অবশ্য ইনকম্ ট্যাক্স হইতে বাদ যায় না ।

(৭) যৌথ-কারবারের ফারম্ ৪৷৫৲ টাকা খরচ করিয়া রেজিষ্টারী করিয়া রাখিতে হইবে। ফারম্ রেজিষ্টারী না করিলে কারবার-সংক্রান্ত কোন মামলা-মোকদ্দমা চলে না।

(৮) কারবারের দৈনিক তহবিল ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া জমা রাখা উচিত। ব্যাঙ্কের চেকে টাকা আদান-প্রদান হইলে, তাহাতে কারবারের সম্রম বাড়ে, মজুত টাকাও নিরাপদ থাকে।

সকল কারবারের পক্ষে অবশ্য একপ্রকার নিয়ম খাটে না। বিবিধ কারবারে হয়ত আরও বিবিধ প্রকার প্রশ্ন জড়িত থাকিতে পারে। তথাপি উল্লিখিত সাধারণ নিয়মগুলি বজায় রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া নূতন কোন প্রশ্ন থাকিলে, তাহাও উহার সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হইবে।

লিমিটেড্ কোম্পানী ও বাঙালী

লিমিটেড্ কোম্পানীকেও যৌথ-কারবার বলে। তবে ঐ কোম্পানী চালাইতে হইলে, কয়েকজন ডিরেক্টর ও একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়া উহা গবর্ণমেণ্টের নিকট কোম্পানীর আইনানুযায়ী রেজিষ্টারী করিতে হয়। পরে সাধারণের নিকট উহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধনের টাকা সংগ্রহ করা হয়।

কোম্পানীর যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকেন, তিনি কার্য্য-পরিচালন করেন এবং কোম্পানীর তহবিল হইতে বেশ মোটা রকম মাসোহারা পাইয়া থাকেন। মাঝে মাঝে কোম্পানির মিটিং করিতে হয়। ঐ মিটিং-এ ডিরেক্টরগণ উপস্থিত থাকিয়া যাহা 'রেজিলিউসন' (Resolution) করেন, তদনুযায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার্য্য করিয়া থাকেন। বাঙালী লিমিটেড্ কোম্পানীতে নিজের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাধারণতঃ বেশীসংখ্যক ডিরেক্টরকে হাতে রাখেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের হাতে ভোট-সংখ্যা বেশী থাকিলে তাঁহার প্রস্তাব পাশ করানো সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা থাকে না। সাধারণের টাকায় অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের ইহাপেক্ষা সহজ পন্থা বড় দেখা যায় না। কারণ লিমিটেড্ কোম্পানী ফেল্ হইয়া গেলে কাহারও কোন দায়িত্ব নাই। এই প্রকার কোম্পানীতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আত্মীয় ও পরিচিত জনই বেশী চাকুরী পাইয়া থাকে। মোট কথা, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সুবিধা বজায় রাখিয়াই সাধারণতঃ লিমিটেড্ কোম্পানী পরিচালিত হয়।

ডিরেক্টরগণের ত্রুটি

শেয়ারহোল্ডারগণের টাকা কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে, অনেক সময় কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ যথোচিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাহা দেখেন না। শুধু মিটিংএ উপস্থিত হইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন এবং 'ফি' (Fee) পকেটস্থ করিয়া ঘরে আসেন। আবার কোন কোন ডিরেক্টর বিবাদ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই মিটিং এ উপস্থিত হন। বাঙালীর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে দুই তিনটি দল থাকে। কোম্পানী যাক্ আর থাক্, সেদিকে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না। দল-বিশেষের জয়-পরাজয়ই মুখ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য বাঙালী-পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানই যে একই ধরণের তাহা নহে। তবে বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানেই যে এ জাতীয় অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বাঙালী কোন লিমিটেড্ কোম্পানী খুলিলে তাহার শেয়ার বিক্রয় করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু অবাঙালীদের উক্ত লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিক্রয় হইয়া যায়। এমন কি, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নির্দ্ধারিত মূলধনের অতিরিক্ত শেয়ারও বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। সাধারণ প্রতিষ্ঠান-গঠনের ব্যাপারে বাঙালী দেশের লোকের কাছে এমন ভাবেই বিশ্বাস হারাইয়াছে যে, বাঙালীর মধ্যে সুযোগ্য কর্ম্মঠ লোকও যদি কোন প্রতিষ্ঠান-গঠনে উদ্যোগী হন, তাহাও সাধারণ লোকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কতকগুলি লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আজ সৎ ও সাধু কর্ম্মীদেরও স্থান করিয়া লওয়া শক্ত হইয়াছে।

বাঙালী-পরিচালিত লিমিটেড্ কোম্পানীগুলি প্রায়ই উকিল, ব্যারিষ্টার এবং অবসর-প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর দ্বারা ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে।

ইহা ভ্রান্ত নীতি বলিয়াই আমার মনে হয়। ব্যবসায় সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদের ডিরেক্টর তালিকাভুক্ত করিয়া বরং জনসাধারণের ধারণা খারাপই করিয়া দেওয়া হয়। যে-সব কোম্পানীতে বড় বড় ব্যবসায়ীর নাম থাকে, তাহার শেয়ার সহজেই বিক্রয় হয়। কিন্তু এই জাতীয় উকিল-ব্যারিষ্টার-এর পরিচালনাধীন কোম্পানীর 'শেয়ার' কেহ বড় আগ্রহ সহকারে খরিদ করে না এবং করিবেও না—যতদিন না লিমিটেড্ কোম্পানীর ব্যবসায়ে বাঙালী সাফল্য, কর্ম্মকুশলতা এবং বিশ্বাসের পরিচয় দিতে পারে।

খাঁটি ম্যানেজিং ডিরেক্টার

লিমিটেড্ কোম্পানীতে চাই সত্যিকার খাঁটি একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি নিরপেক্ষ, স্বার্থশূন্য, ও ব্যবসাবুদ্ধিশীল লোক হয়, তাহা হইলে কখনই কোম্পানী নষ্ট হয় না। যিনি রক্ষক তিনি ভক্ষক হইলেই সর্ব্বনাশ—কোম্পানীর 'লিকুইডেসন' ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বাঙালীর লিমিটেড্ কোম্পানী ফ্লোট্ (float) করা আর বাঙালী জাতিকে মাঝ-দরিয়ায় ভাসাইয়া দেওয়া একই কথা।

বস্তুতঃ লিমিটেড্ কোম্পানীগুলির কথা বলিতে বসিয়া বাঙালীর বিশ্বাস-ঘাতকতার চেয়েও তাহার দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব ও অদূরদর্শিতার কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে। জনসাধারণের অর্থে এই সব কোম্পানীর মূলধন—এই টাকা লইয়া ছিনি-মিনি খেলিবার ফলে একদিন যখন কোম্পানী 'লিকুইডেশনে' যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টার মহোদয়েরা হয়তো একটুখানি ভাবিয়া দেখেন না—ইহাতে কত অনাথার, কত নিঃসম্বলের সর্ব্বনাশ হইল। যতদিন এ জাতির মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী কোন স্থানই করিয়া লইতে পারিবে না।

ইউরোপীয় আদর্শ হইল সঙ্ঘবদ্ধভাবে শক্তিশালী যৌথ-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশকে শক্তিশালী করা। আর ভারতীয় আদর্শ—স্ব স্ব ভাবে ব্যবসা ও কুটীরশিল্প-পরিচালন। ইংলণ্ডের শক্তিশালী বণিক্-সম্প্রদায় রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিযোগিতা করায়, ব্যক্তিগতভাবে (individually) পরিচালিত ভারতীয় বাণিজ্য ও কুটীর-শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয়গণ যদি ইংলণ্ডের আদর্শে যৌথভাবে বাণিজ্য পরিচালনে সক্ষম থাকিত, তবে আজ ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতবাসীর এই শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত না।

বিদেশী বণিক্-সম্প্রদায় যৌথভাবে নিজের দেশে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া, উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিয়া জাহাজ ভাড়া, শুল্ক ও বীমার টাকা যোগাইয়া ভারতে আসিয়া ব্যবসায় করে। আর বাঙালী তাহার নিজের দেশে বসিয়া সামান্য মজুরী প্রদানে ঐ জাতীয় ব্যবসা করিবার সুবিধা পাইয়াও কি বিদেশী বণিকগণকে প্রতিযোগিতায় হটাইতে পারে না? অবশ্যই পারে, যদি বাংলা নিজের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে শিখে। কিন্তু এ 'যদি'র মীমাংসা হইবে কবে, তা'ই সমস্যা।

ব্যবসায়-নির্ব্বাচন

বাঙালীর ব্যবসায়-সংক্রান্ত বই লিখিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্যবসায় সম্বন্ধে আমি একজন সর্ব্বজ্ঞ। কোন্ ব্যবসায় করিলে কিরূপ লাভ হইবে,—এ সম্বন্ধে আমাকে কেহ প্রশ্ন করিলে হয়তো তাহার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। তবে কেহ যদি কোন ব্যবসায় করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঐ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে ব্যবসার মূলসূত্র সম্বন্ধে যতটুকু আমার অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে তাঁহার মূলধন, কর্ম্মক্ষমতা, ও মাসিক খরচের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়-পরিচালন তাহার পক্ষে সম্ভব কিনা যুক্তি দিতে পারিব ভরসা করি। কাহার কি ব্যবসায় করিলে লাভ হইবে, এ প্রশ্নের জবাব কোন ব্যবসায়ীই দিতে পারেন না। কারণ ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান অনেক সময় নির্ভর করে ব্যবসায়ীর বুদ্ধি ও কর্ম্ম-কুশতার উপর। ব্যবসায় মাত্রেই যে অল্প-বিস্তর লাভ আছে, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু সেই লাভে ঘরভাড়া, লোকের মাহিনা প্রভৃতি মাসিক ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াও লাভ থাকিবে কিনা ইহাই চিন্তা ও হিসাবের বিষয়। অনেক অনভিজ্ঞ লোক কোন নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সময় ব্যয়ের অঙ্ক কম ধরিয়া লাভের অঙ্কটাই বেশী করিয়া ধরেন। কাজেই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের অসুবিধায় পড়িতে হয়; বরং লাভের অঙ্ক কম ধরিয়া ব্যয়ের অঙ্ক বেশী ধরাই উচিত।

সাধারণতঃ ব্যবসায় আরম্ভ করিলে প্রথম প্রথম লোকসান হইবার সম্ভাবনা অধিক। ব্যবসায় একটু পুরাতন না হইলে খরিদ্দার-সংখ্যা

ও লাভের মাত্রা বাড়ে না। যাঁহাদের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া উহা হইতে টাকা লইয়া সংসার চালাইতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসায় করা উচিত নহে।

আয়-ব্যয়

যে-কোন নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে হিসাব করিতে হইবে যে, উক্ত ব্যবসার মাসিক ব্যয় কত কমে সঙ্কুলান হইতে পারে। যাঁহার ব্যবসায়ে মাসিক ব্যয় যত কম হয় তাঁহার লোকসানের আশঙ্কাও তত কম থাকে। যে-কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আনুষঙ্গিক ব্যয়ের একটা পরিমাণ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা কখনই সম্ভব হয় না। উহা নির্ভর করে খরিদ-বিক্রয়ের উপর। গোড়া হইতে যদি ব্যবসায়ের পরিচালন-ব্যয় কম হয়, তাহা হইলে সে ব্যবসায় নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। লাভের পরিমাণ কম হউক আর বেশী হউক, খরিদ-বিক্রয়ের উপর যখন কিছু না কিছু লাভ রাখিয়া বিক্রয় হয়, তখন প্রথম প্রথম আয় হইতে ব্যয় সম্পূর্ণ সঙ্কুলান না হইলেও ক্রমশঃ উহা হইতে পারে। ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে ব্যবসায়ীর সততা ও গ্রাহকগণের বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির উপর।

কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া উহাকে উহার নিজের আয়ের উপর দাঁড় করাইতে (self-supporting) অন্ততঃ পক্ষে তিন বৎসর সময় লাগে। মহাজন ও খরিদ্দারের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে একটু সময়ের প্রয়োজন।

মূলধন খাটাইবার নিয়ম

যে-কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা যাক্ না কেন, প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট মূলধনের এক-তৃতীয়াংশের বেশী টাকার মাল খরিদ করা উচিত

নহে। কোন কারবারের তিন হাজার টাকা মূলধন হইলে দু'হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখিয়া, প্রথমতঃ হাজার টাকার মাল খরিদ করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। কারণ হাজার টাকার মাল খরিদ করিলে, হয়তো পাঁচশত টাকার মাল ঘরে মজুত থাকিবে, তিনশত টাকা ধার দিতে হইবে। নগদ-বিক্রয়ে হয়তো দুইশত টাকা মাত্র হাতে মজুত থাকিবে। কিন্তু এই হাতে-মজুত দুইশত টাকার মাল খরিদ করিলেই ব্যবসা চলিবে না। উহার সহিত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার (Reserve) পাঁচশত টাকা উঠাইয়া লইয়া দ্বিতীয়বারে অন্ততঃ সাতশত টাকার মাল খরিদ দরকার হইয়া পড়ে। এইভাবে কিছুদিন কারবার চালাইবার পর খরিদ্দারকে নির্দ্দিষ্ট কত টাকা পরিমাণ ধার দেওয়া আবশ্যক, এবং দোকানে কত মাল সর্ব্বদা মজুত থাকা দরকার তাহা স্থির হইয়া যাইবে। তারপর ক্রমশঃ মহাজনের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া উঠিতে পারিলে ধারেও মাল পাওয়ার সুবিধা ঘটিবে। কিন্তু খরিদ্দারকে ধারে মাল বিক্রয় করিবার একটা মাত্রা নির্দ্দিষ্ট থাকা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা অতিরিক্ত ধার দিয়া, সময়মত যদি টাকা আদায় না হয়, তবে মহাজনের তাগিতমত 'ডিউ' পরিশোধ করিতে না পারিলে বিশ্বাস নষ্ট হইতে পারে। ব্যবসায়ীর সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন মহাজনের টাকা 'ডিউমত' শোধ করিতে কোনপ্রকার অসুবিধা না ঘটে।

ধারে-বিক্রয়

কোন ব্যবসায়ীকে ধারে মাল বিক্রয় করিবার সময় তাহাদের কারবারের অবস্থা ও অংশীদারগণের সমস্ত খবরাখবর লইয়া তবে ধারে মাল দেওয়া উচিত। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে ঠকিবার আশঙ্কা থাকিবে। আজকালকার বাজারে ধারে মাল লইবার উদ্দেশ্যে নূতন

কারবারে অনেক খরিদ্দার জুটিয়া যায়। তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে টাকা আদায়ে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, এমন কি কোন কোন খরিদ্দারের টাকা মোটে আদায়ই হয় না। এ জাতীয় খরিদ্দারের প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহারা দর সম্বন্ধে কোন আপত্তি বড় করে না; ধারে পাইলে হাতী কিনিতেও রাজী।

অনেক জিনিষ আছে, যাহাতে লাভের হার বেশী, কিন্তু বিক্রয় কম—যেমন লোহার আলমারী, বন্দুক, রেডিও প্রভৃতি। এ সকল জিনিস নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন হয় না, কাজেই বিক্রয়ও কম,—তাই লাভ রাখিতে হয় বেশী। আবার যে-সমস্ত জিনিসের বিক্রয় বেশী, তাহার লাভের হার খুব কম। এসব জিনিষ গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয়। যেমন চাউল,—ইহাতে মণকরা এক আনা দু'আনার বেশী লাভ হয় না। আবার বাজার-দর হঠাৎ কম-বেশী হইলে লাভ-লোকসান দুইই হইতে পারে। এই সমস্ত জিনিষের বাজার-দর যখন কম থাকে, সে সময় মাল খরিদ করিয়া মজুত রাখিতে পারিলে লাভ হয়। এই জন্যই ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আবশ্যক।

অল্প মূলধনে ব্যবসায়

পল্লীগ্রামের লোকের অল্প মূলধনে কলিকাতায় কোন ব্যবসা করা উচিত নহে। তাহাতে মূলধন হারাইয়া অনেককে ঘরে ফিরিতে হয়। পল্লীগ্রামের অনেক বেকার কোনমতে দু'এক শত টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া ধোপার দোকান, কিম্বা চায়ের দোকান খুলিয়া বসেন। অবস্থাটা তাতে কি দাঁড়ায়, ? প্রথমতঃ তাঁহাদের পুঁজির অর্দ্ধেক টাকা দোকানের সাজ-সরঞ্জাম খরিদ করিতেই ব্যয় হইয়া যায়। উহার মাসিক আনুমানিক ব্যয়,—ঘর-ভাড়া ১৫৲ টাকা; আলো, লাইসেন্স, ট্যাক্স, ১০৲ টাকা; নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যয়ও অন্ততঃপক্ষে

১৫৲ টাকা—একুনে ৪০৲ টাকার কমে মাসিক-ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। মাসিক এই চল্লিশ টাকা ব্যয়-সঙ্কুলান হইয়া অতিরিক্ত কিছু আসিলে তবেই মুনাফা। আচ্ছা, মুনাফার পরিমাণটা এবার ধরা যাক্। সাধারণতঃ অনেক ডাইং ক্লিনিং-দোকানে প্রতি কাপড়ে ৶১০ পয়সা হিসাবে চার্জ্জ করা হয়, তাহাতে শতকরা হয় ৩৵০। এই সমস্ত কাপড় ধোপার নিকট হইতে শতকরা ২৸০ টাকায় কাচাইয়া লওয়া হয় শুনিয়াছি। তাহা হইলে যদি দৈনিক মোটামুটি চারি শত কাপড় কাচান যায়, তবে ১॥০ টাকা (।৵০ × ৪) লাভ হইয়া দোকানের দৈনিক-ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে। কিন্তু ঐ পরিমাণ কাপড় সংগ্রহ করা অল্প-সংখ্যক দোকানের পক্ষেই সম্ভব। আরজেন্ট্ কাপড়ে অবশ্য কিছু বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সংখ্যা কম। ইহার উপর কাপড় হারাইয়া গেলে দণ্ড দিতে হয়। অবশ্য ব্যবসায়ীর রসিদে লিখিত থাকে যে, হারাণো বা কাটা-ছেঁড়ার জন্য কোম্পানী দায়ী নয়, কিন্তু ঐ লেখার কোন মূল্য নাই। খরিদ্দারের লোকসান হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতেই হয়। ফলে লোকসান দিয়া কিছুদিন পরে দোকান গুটাইতে হয়। যাহারা কলিকাতার বাসিন্দা, থাকা-খাওয়ার ব্যয় লাগে না, তাহাদের পক্ষে বরং এই ব্যবসা করা চলে, কিন্তু মফঃস্বলবাসীর পক্ষে ইহা মোটেই সুবিধার নহে। এই সমস্ত আয়-ব্যয়ের সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া তবে ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত। আয় অপেক্ষা ব্যয়ের হিসাবই বেশী করিয়া ধরা উচিত। তাহাতে ঠকিতে হয় না।

পল্লীবাসী বেকার-সম্প্রদায়ের পক্ষে সামান্য মূলধন লইয়া কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসা করিবার চেষ্টা না দেখিয়া বরং যাঁহাদের যে সমস্ত পল্লীতে বাস, তাঁহারা তথাকার উৎপন্ন লঙ্কা, হলুদ, তেতুল, তুলা, পাট প্রভৃতি খরিদ করিয়া নিকটবর্ত্তী হাটে হাটে বিক্রয় করিলে,

কিছু কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে, এবং উহাতে মূলধন একেবারে নষ্ট হইবার আশঙ্কাও কম। এই সমস্ত কাজে চাই পরিশ্রম ও খোঁজ-খবর রাখার ক্ষমতা (ability)। পাটের মরশুমে কলিকাতার অনেক বড় বড় পাটের ব্যবসায়ী মফঃস্বলের অনেক স্থানে পাট খরিদের জন্য আড়ত খুলিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত আড়তে গৃহস্থের বাড়ী হইতে পাট খরিদ করিয়া যোগান দিলে কিছু কিছু লাভ হয়। এই সমস্ত বিষয় "ব্যবসায়ে বাঙালীর পথ-নির্দ্দেশ" প্রবন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। পল্লীগ্রামের যে-সমস্ত বেকার ১৫।২০৲ টাকা মাহিনায় চাকুরীর জন্য কলিকাতায় আসিয়া জুতার তলা ক্ষয় করিতেছে, থাকা-খাওয়ার খরচ-বাদে ৫।৭৲ টাকার বেশী তাহাদের বাঁচে না —যদিই চাকুরি জুটে। খোঁজ-খবর লইয়া ঐ সমস্ত ব্যবসায়ে হাত দিলে বাড়ী বসিয়া এরূপ ৫।৭৲ টাকা উপার্জ্জন তাহারা অবাধেই করিতে পারে।

মাছের চাষ

পল্লীর অধিকাংশ স্থলেই আজকাল মৎস্যাভাব। ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে অনেক গৃহস্থ অর্থব্যয় করিয়াও রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি মৎস্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। পল্লীবাসী বেকার-সম্প্রদায় যদি পল্লী-অঞ্চলের পুরাতন কিংবা শরিকী পুকুরগুলি* জমা লইয়া উহাতে মাছের ডিম ছাড়িয়া মাছের চাষ করেন, তাহাতে বেশ লাভ হইতে পারে। ২।৩ মাসের মধ্যে মাছ একটু বড় হইলে, উহা গ্রামবাসী গৃহস্থগণের পুষ্করিণীতে ছাড়ার জন্য বিক্রয় করিলে, ডিম-খরিদের আসল টাকা উহা হইতে তুলিয়া লওয়া যায়। পরে অবশিষ্ট মৎস্য

* কথায় বলে "ভাগের মা গঙ্গা পায় না"। শরিকী পুকুরগুলির প্রায়ই সংস্কার হয় না। শরিকগণের মধ্যে কাহারও সংস্কারের সামর্থ্য থাকিলেও অন্যান্য শরিক তাহা করিতে দেয় না। তবে বাহিরের যে-কোন লোক উহা পাইতে পারে।

৩।৪টি পুষ্করিণী জমা লইয়া তাহাতে ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। এক পুষ্করিণী হইতে অন্য পুষ্করিণী,—এইভাবে ওলট্‌-পালট্‌ না করিলে নাকি মৎস্য শীঘ্র শীঘ্র বড় হয় না শুনিতে পাই। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লোকের পরামর্শ লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলে ২।১ বৎসরের মধ্যে নিজেদের একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়া যায়। এই সমস্ত কাজ ২।৪ জনে মিলিয়া করিলে সুবিধা হয়। অনেক পল্লীগ্রামেই মাছের চাষ একটা ভাল ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু কি উপায়ে মাছের চাষ করিলে, উক্ত ব্যবসায় লাভ জনক হইবে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় বিশেষ দরকার। নচেৎ আশানুরূপ লাভ হইবে না। এই সমস্ত কাজে বারমাস সমান পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহাতে মূলধনেরও খুব বেশী দরকার হয় না।

দৈনিক এক পয়সা

রাতারাতি বড়লোক হইবার পন্থা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। একেবারে কর্ম্মহীন বেকার অবস্থায় উপবাস করার চেয়ে দৈনিক এক আনা রোজগার হইলেও ত লাভ।

বাংলা দেশে সাতকোটী লোকের বাস। ইহার মধ্যে বালক, বালিকা, অন্ধ, অক্ষম, অনিচ্ছুক প্রভৃতিতে ছয়কোটী লোককেই বাদ দিয়াও মাত্র এক কোটী লোকও যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলে "দৈনিক অন্ততঃ এক পয়সা উপার্জ্জনের কোন কাজ না করিয়া নিদ্রা যাইব না," তাহা হইলে প্রতিদিন বাংলায় ১৫৬২৫০৲ উপার্জ্জন হয়। হয়ত অনেকে বলিতে পারেন, "আমরা যখন দৈনিক ২।৫৲ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতেছি, তখন এক পয়সা রোজগারের সার্থকতা কি?" সার্থকতা আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, যিনি দৈনিক দশটাকাও রোজগার করেন, তাঁহার কাছেও কোন ভিখারী হাত বাড়াইলে

তিনিও একটি পয়সা দান করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বলেন, "মাপ কর"। সমষ্টিগত এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয় হইতে অনেক বড় বড় কাজ সাধন করাও চলে। কোন একটা পল্লীগ্রামে যদি দুইশত লোকের বাস হয়, তবে একপয়সার কাজে হয়ত দৈনিক ৩৵৹ সংগ্রহ হইতে পারে; মাসে ৯০৲ টাকার উপর রোজগার হয়। উহা একটি ফণ্ডে মজুত করিয়া উহার দ্বারা কি দরিদ্র-সেবা, পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি, রাস্তাঘাট সংস্কারের সাহায্য হইতে পারে না? প্রশ্ন হইতে পারে যে,—উক্ত এক পয়সা রোজগারকে কিভাবে করিবেন! সকলের পক্ষে অবশ্য একই উপায়ে উক্ত এক পয়সা রোজগার করা সম্ভব নয়, উচিতও নহে। কারণ একই প্রকারের জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রস্তুত হইলে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না।

কাজেই যাহার দ্বারা যে কাজের সুবিধা হইবে, চিন্তা করিয়া তাহাকে সেই পথ ধরিয়া কাজ করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই চরকায় সূতাকাটা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে কেহ সূতাকাটা, কেহ পাট হইতে দড়ি প্রস্তুত, কেহ একখানি তালপাতার পাখা, কেহ দোকানদারদের জন্য কাগজের ঠোঙ্গা, কেহ হয়ত দৈনিক ১০০ শত বিড়ি প্রস্তুত করিলেন, এইভাবে যাঁহার পক্ষে যাহা সুবিধা, তাঁহার পক্ষে সেই কাজ করাই ভাল। কাহার কোন্ কাজের সুবিধা হইবে, তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া চলে না। একটু চিন্তা করিলে সকলেই হয়তো এক পয়সার কাজের সন্ধান পাইতে পারেন।

জামা, হাফ-প্যাণ্ট সেলাই

বাংলার ছোট ছোট বালক-বালিকারা সর্ব্বদা হাফ্ প্যাণ্ট পরিধান করে। ঐ সমস্ত প্যাণ্ট চেত্‌লা ও হাওড়া হাট হইতে মফঃস্বলস্থ

ব্যবসায়ীরা খরিদ করিয়া থাকেন। মফঃস্বলের প্রায় সকল গ্রামেই বেকার-সম্প্রদায়ের জামা তৈয়ারী দরজির দোকান দেখা যায়; ঐ সমস্ত জামা-ব্যবসায়ীরা হাফ প্যান্ট্ কাপড় কাটিয়া দিয়া, যদি গৃহস্থ বাড়ী হইতে প্রত্যেকটি ৴১০, ৴৫ মজুরী দিয়া সেলাই করিয়া লন, এবং হাওড়া হাট হইতে ছোট ছোট জামা খরিদ না করিয়া, ঐ ভাবে খুচরা পাইকারগণকে সরবরাহ করিয়া স্থানীয় লোকের প্রয়োজন মিটাইতে থাকেন, তাহাতে অনেক গৃহস্থ মেয়েদের ১০ কিম্বা ৵০ রোজগার হওয়া অসম্ভব নহে, এবং হাতের সেলাইও মজবুত হইবে। আগড়পাড়ায় যৌথভাবে উক্ত প্রকারের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় অনেকগুলি বেকার দৈনিক ।/০, ।৵০ রোজগার করে শুনিয়াছি।

বিড়ির ব্যবসা

কলিকাতায় অনেক বেকার বিড়ি বাঁধিয়া দৈনিক খোরাকীর ব্যবস্থা করিতেছে। পল্লী-অঞ্চলের অনেক বেকারও এই উপায়ে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিতেছে। পল্লী-অঞ্চলের ২।৪ জন মিলিয়া যদি কিছু মূলধন ফেলিয়া বিড়ির পাতা, তামাক, আমদানী করিয়া কিছু কিছু মজুরি দিয়া, পল্লীর ঐ সমস্ত বেকারদিগকে কাজে নিযুক্ত করেন, এবং ঐ সমস্ত বিড়ি নিকটবর্ত্তী হাট, বাজার, গঞ্জে দোকানদার-দিগকে পাইকারী দরে বিক্রয় করেন, তবে তাঁহাদেরও কিছু কিছু লাভ হয়, এবং বেকার-সম্প্রদায়ও হয়ত ৵০—৶০ রোজগার করিতে পারে। কিন্তু বাঙালীর যাহা মজ্জাগত অভ্যাস, বিক্রয়ের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি পাইলে বেশী লাভের আশায় তামাক কম দিয়া জিনিস খারাপ করা হয়। তাহাতে পশার নষ্ট হইয়া যায়, এবং পাইকার দোকানদারগণ আর উহা লইতে চাহে না। কাজেই ব্যবসায় আর চলে না। ইহাতে পাইকার দোকানদারগণেরও একটু

সহানুভূতি থাকা দরকার। কারণ মফঃস্বলের দোকানদারগণ কলিকাতা হইতে যে-সমস্ত বিড়ি আমদানী করিয়া থাকেন, তাহা যদি তাঁহারা দেশে বসিয়া কলিকাতার দরে বেকার-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে খরিদ করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিরন্ন প্রতিবাসীদের মুখে অন্নদান করা হইবে। পরস্পরের প্রতি যদি এ জাতীয় সহানুভূতি না থাকে, তবে বাংলার এই শোচনীয় অর্থ-সঙ্কটের দিনে বেকার-সম্প্রদায়ের অনাহারে মৃত্যু ছাড়া সোজা পথ আর নাই।

ঐ জাতীয় বিড়ির ব্যবসা কয়েকজন মিলিয়া যৌথভাবে করা উচিত, নতুবা প্রত্যেকে স্ব স্ব ভাবে ঐ কার্য্য আরম্ভ করিলে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। প্রথমতঃ বাংলার 'একাদশী মন্ত্রিমণ্ডল' তো তামাকের উপর ধার্য্য কর এবারও যেন বহাল রাখিয়া দিলেন, তাহার ফলে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ লাইসেন্স ফিঃ দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে-সমস্ত পাইকার-দোকানদারগণ ঐ সমস্ত মাল লইবে, তাহাদের নিকট বিড়িওয়ালার যদি পৃথক্‌ভাবে মাল বিক্রয়ের চেষ্টা করে, তাহাতে একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়া পড়িবে। একই খরিদ্দারকে একাধিক ব্যবসায়ী মাল লইতে অনুরোধ জানাইলে, ক্রেতা যাহার নিকট ভাল মাল এবং দর এক পয়সা সুবিধা পাইবে, তাহার মালই খরিদ করিবে। ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যা বেশী হইয়া পড়িলে বিক্রেতার মুনাফা ক্রেতাই খায়। প্রতিযোগিতার চাপে পড়িয়া সস্তায় মাল বিক্রয় করিতে হইলে ক্রমশঃ ভেজাল ছাড়া উপায় থাকে না। এই কারণেই তৈল, ঘি প্রভৃতিতে দিন দিন ভেজালের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহাতে সমস্ত ব্যবসায়ের লাভও কমিয়া গিয়াছে। যৌথভাবে যে-কোন কাজ করিলে একদিকে উহা যেমন শক্তিশালী হয়, অপরদিকে প্রতিযোগিতাও তেমনি কম থাকে।. কিন্তু যৌথ-কারবারে বাঙালী-জাতির ইতিহাস অগৌরবেরই ইতিহাস।

মাদুর-প্রস্তুত

খুলনা জেলার অনেক স্থানে খাল-বিলে "মেলে" নামক একপ্রকার ঘাস উৎপন্ন হয়। স্থানীয় পোদ-জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ঐ সমস্ত ঘাসের দ্বারা মোটা মাদুর প্রস্তুত করিয়া পাইকারদিগের নিকট বিক্রয় করে। পাইকারগণ উক্ত মাদুর কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে চালান দেয়। বেলেঘাটায় ঐ জাতীয় মাদুরের কতকগুলি আড়ত আছে। বাংলার কোন 'এক্সপার্ট' যদি গবেষণার দ্বারা ঐ জিনিসটিকে উন্নত ধরণে প্রস্তুত-প্রণালীর নির্দ্দেশ দিতে পারেন, তবে কতকগুলি লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় হইতে পারে।

বাংলায় এমন অনেক জিনিস আছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাহার গবেষণা করিতে পারিলে বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। কিন্তু যে-সমস্ত লোক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবেন, পেটের জ্বালায় তাঁহাদিগকে চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিতে হইতেছে। এ অবস্থায় পরীক্ষামূলক কাজে অর্থব্যয় ও সময় নষ্ট করিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়!

কৃষি ও শিল্প

কৃষি-প্রধান বাংলাদেশের জমীতে বর্ত্তমানে যে-পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ করিতে পারিলে তাহার দুই-তিন গুণ ফসল অনায়াসে পাওয়া যায়। বাংলার লোক-সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের চেষ্টা না করিলে, বাংলার দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়াই চলিবে। অনেকের মনে একটা প্রশ্ন জাগিতে পারে—অতিরিক্ত পাট-উৎপাদনের ফলে তো পাটের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই অতিরিক্ত ফসল জন্মিলে উহার মূল্যও কমিয়া যাইবে। এ প্রশ্নের পিছনে খুব যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। পাটের খরিদ্দার একচেটে,—বাংলার বা ভারতের বাহিরের নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মিলওয়ালা ভিন্ন আর উহার কোন খরিদ্দার নাই, সুতরাং তাহারা একজুট হইয়া তাহাদের নির্দ্ধারিত দরের বাহিরে উহা খরিদ করে না। কাজেই পাটের সহিত অন্যান্য ফসলের তুলনা করা চলে না। পূর্ব্বে বাংলাদেশে যে-সমস্ত জমী পতিত অবস্থায় ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অধিকাংশ জমীতে ফসল হইতেছে। বাংলাদেশে যদি এক বৎসর ধানের ফসল অজন্মা হয়, তবে রেঙ্গুন হইতে লক্ষ লক্ষ বস্তা চাউল আমদানি না হইলে বাংলার লোকের অনশনে থাকিতে হয়। গত ১৩৪২ সালে বাংলায় ধান্য ভাল না হওয়ায় ১৩৪৩ সালে একমাত্র কলিকাতা বন্দরে ৯৩ লক্ষ বস্তা রেঙ্গুন চাউল আমদানি হইয়াছিল। এজন্য পাটের চাষ কমাইয়া দিয়া অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। বর্ত্তমানে যে জমীতে প্রতি বিঘায় ৬।৭ মণ ধান উৎপন্ন হয়, ঐ জমীতে

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে দ্বিগুণ তো হইবেই, তাহারও উপরে হওয়া অসম্ভব নয়। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় শুধু গোবরের সারের আশ্রয় লইয়া কৃষকেরা ঐ অঞ্চলের জমীতে প্রতি বিঘায় ২০ মণ পর্য্যন্ত ধান্য উৎপন্ন করিতে শুনিয়াছি। অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইলে ফসলের মূল্য কমিয়া যাইবে—জমীর মালিকগণের এ আশঙ্কা করার হেতু নাই। কারণ বর্ত্তমানে যে-জমীতে মালিকগণ বিঘা প্রতি ৬/ মণ ফসল পাইতেছেন—যদি ধরা যায় উহার মূল্য ১২৲ টাকা, ঐ জমীতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে অন্ততঃ ১৫/ মণ ফসল হইতে পারে, এবং সে ফসলের মূল্য মণকরা ২৲ টাকার স্থলে কমিয়া ১৲ টাকা হইলেও, প্রতি বিঘায় ১২৲ টাকার স্থলে ১৫৲ আয় হইতে পারে। ইহাতে চাষের খরচা যদি বিঘা-প্রতি ২।৩৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহা হইলেও গড়ে মালিকদের লোকসান নাই। অথচ ফসলের মূল্য সস্তা হইলে সাধারণ লোকের হাহাকার দূর হইবে।

জমীর সার

কলিকাতা ১৮নং ষ্ট্রাণ্ড্ রোডস্থিত মেসার্স ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ কোং জমীর সার বিক্রয় করিয়া থাকেন। মফঃস্বলবাসীরা উক্ত কোম্পানীকে লিখিলে, কোম্পানী তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেন। কোন্ জমীতে কিভাবে কি প্রকার সার দিলে, ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে, তাহা কোম্প্যানীর প্রতিনিধি জমীর মালিকগণকে বুঝাইয়া দিয়া আসেন। বাংলার কোন কোন স্থানে এরূপ পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। তবে উহাতে নাকি কিছুদিন পরে জমীর শক্তি কমিয়া যায় শুনিয়াছি।

'পাব্‌লিক ইন্‌ডাষ্ট্রীজ্ ও রাজবন্দী'

গবর্ণমেন্টের "পাব্‌লিক ইন্‌ডাষ্ট্রীজ্" বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের

উদ্যোগে ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাবড়া থানায়, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাংলার রাজবন্দীদের ৮।৯ শত বিঘা জমী বন্দোবস্ত দিতেছেন। যদি রাজবন্দীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই সমস্ত জমীর চাষ করিতে সক্ষম হন, তবে হয়তো উহাতে তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান হইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছাড়া সাধারণ চাষীর মত চাষ করিলে উহাতে কোন ফল হইবে না। গবর্ণমেণ্টের 'পাবলিক ইন্‌ডাষ্ট্রীজ্' বিভাগ অনেক বেকার লোককে, অনেক প্রকার শিল্পশিক্ষা দিয়া বলিয়া থাকেন যে, ইহাতে মাত্র ৪।৫ শত টাকা মূলধন ফেলিয়া এই সকল ব্যবসায়ে মাসিক একশত টাকার উপর লাভ হইবে। উহা একেবারেই কল্পনায় আকাশ-কুসুম রচনা। সাবান, ছাতার বাঁট, কাতাদড়ি, পাপস প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া ৪।৫ শত টাকা মূলধনে, মাসিক একশত টাকার উপর আয় হইলে, বাংলায় আর বেকার-সমস্যার নাম-গন্ধও থাকিত না। বাংলাদেশের লোকের বর্ত্তমানে মাথায় তেল জুটিতেছে না, সেজন্যই বোধ হয় বেকারদের সাবান-প্রস্তুত শিক্ষা দিয়া, তেলের সমস্যা সাবানে সমাধান করিবার চেষ্টা হইতেছে। পাব্‌লিক্ ইন্‌ডাষ্ট্রীজের ঐ সমস্ত শিক্ষায় মাসে ৮।১০৲ টাকার বেশী আয় হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা শক্ত। তাহাও যে সব জায়গায় সম্ভব হইবে, তা নয়। মফঃস্বলের যে-সমস্ত স্থানে অধিক লোকের বাস, একমাত্র তথায় কারখানা স্থাপন করিলেই ৮।১০৲ টাকা আয় হইতে পারে।

নারিকেল-ছোবরা

পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল-ছোব্‌রা পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ছোব্‌রা দ্বারা গৃহস্থেরা রান্না করে। পাব্‌লিক ইন্‌ডাষ্ট্রীজের তত্ত্বাবধানে বরং যদি কাতাদড়ি ও পাপ্‌স প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া, বেকারগণ পূর্ব্ববঙ্গের ঐ সমস্ত স্থানে গিয়া বসে, মাসে ৫।৭৲ টাকা আয়

হইতে পারে। বেকার-অবস্থায় একেবারে চুপচাপ বসিয়া থাকা অপেক্ষা এ সমস্ত কাজে যদি ৫।৭৲ টাকাও উপার্জ্জন হয়, সেও মন্দের ভাল। তবে পূর্ব্ববঙ্গের ঐ সমস্ত নারিকেল-ছোব্‌রায় কাতাদড়ি ভাল হয় না। যাহা হউক, মোটা কাতাদড়িও যখন অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা একেবারে অচল হইবে বলিয়াও মনে করা যায় না। 'পাপ্‌স' কলিকাতায় কোন মহাজনের ঘরে চালান না করিলে, পল্লীগ্রামে খুব বেশী বিক্রয় হয় না। কাতাদড়ি মফঃস্বলে বিক্রয় হইতে পারে।

এই সমস্ত কুটীর-শিল্পে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে না। তবে শুধু চুপ-চাপ গৃহে বসিয়া থাকিয়া কিম্বা চাকুরীর জন্য এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিয়া যখন সমস্যার সমাধান হয় না, তখন 'বেকার থাকার চেয়ে ব্যাগার খাটা ভাল'—এই প্রচলিত বচনটি মানিয়া লওয়া মন্দ কি? আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে অতি সামান্য কাজের ভিতর দিয়াও এমন অভিজ্ঞতা জন্মে, যাহাতে হীন অবস্থা হইতে অনেককে উন্নতি করিতে দেখা গিয়াছে। একটা উদাহরণ দিই। কলিকাতা সহরে হরিশ্চন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক লোক ছেঁড়া নেকড়া কুড়াইয়া কাগজের কলে সরবরাহ করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন। ছেঁড়া নেকড়ায় বড়লোক হওয়ায়, আজও অনেকের মুখে তাঁহার নাম "হরিশ নেকড়া" বলিতে শুনা যায়।

চর্‌কা

মহাত্মা গান্ধীর চরকায় সূতোকাটা আন্দোলনের সময়ে, খুলনা জেলার অধিবাসী বাবু হরেন্দ্র নাথ ঘোষ (এম, এ) মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া একটি উন্নত ধরণের চরকা আবিষ্কার করেন। কিন্তু বাংলায় এমন একটি ধনী জুটিল না যে, মূলধন সরবরাহ করিয়া উহা প্রচলন করেন (popularise)। কাজেই হরেনবাবু উক্ত চরকা ম্যাকলিয়ড্‌

কোম্পানীকে দিয়া, বর্ত্তমানে উহার কমিশন্ ইত্যাদিতে মাসিক ৩।৪ শত টাকা পান শুনিয়াছি।

অনেক সময় যাহা অতি ক্ষুদ্র ও হীন কাজ বলিয়া মনে করা হয়, অধ্যবসায় থাকিলে, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র হীন কাজেও অনেককে উন্নতি করিতে দেখা যায়। জাপানীরা দাঁত-খোঁচানো কাঠি কাগজের কৌটায় বোঝাই করিয়া লেবেল্ আঁটিয়া ভারতে বিক্রয় করিয়া যাইতেছে। জাপানী খেল্‌নায় তো ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঐ সমস্ত চকমকে খেলনা আমরা যতই সস্তা দামে খরিদ করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে টাকাটা আমাদের বিদেশে মণিঅর্ডার হইয়া যায়। প্রতিদিন সকালে শয্যাত্যাগের পর হইতে আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য অধিকাংশ জিনিসের মূল্য আমরা বিদেশে প্রেরণ করিতেছি। সকালে উঠিয়াই টুথ্ পাউডার, টুথ্ ব্রাশ, দাড়ি কামানোর ব্লেড্, চায়ের সরঞ্জাম, সিগারেট, ম্যাচ, আয়না, চিরুণী, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি যাবতীয় নিত্য-ব্যবহার্য্য অধিকাংশ জিনিসের মূল্যই আমাদের বিদেশে যায়। আমরা যদি বিদেশ হইতে কিছু আদায় করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে, বিদেশে কিছু প্রেরণ করিলেও তত কিছু ক্ষতি ছিল না। বর্ত্তমানে আমাদের এই সঙ্কীর্ণ আয়েরও অর্দ্ধেক টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তাইতো ভাবি, এ জাতির তিলে তিলে মৃত্যু ছাড়া আর উপায় কি ?

ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা

ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই এই পুস্তকে স্থানে স্থানে আলোচনা করিয়াছি। কাজেই এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু আলোচনা করিব না, শুধু ইহার মূল কারণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব মাত্র। ব্যবসায়ীর সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই যে এই প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে একথা সত্য হইলেও তাহাই একমাত্র কারণ নহে। ইহার মূলে রহিয়াছে কতকগুলি গলদ—যেমন, ব্যবসায়ী-দিগের সঙ্ঘবদ্ধতা নাই—পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার মিল বা একতা নাই। একে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা-ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, তদুপরি অবাঙালী ব্যবসায়ীদিগের সহিত বাঙালী ব্যবসায়ীদিগের ঠোকাঠুকি লাগিয়া আছে। যে যেভাবে পারিতেছে, বাজার দখলের চেষ্টা করিতেছে। সস্তায় মাল বিক্রয় করিয়া খরিদ্দার হাত করার জন্য ভেজালের মাত্রাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক ব্যবসায়ী খরিদ্দারকে বাজারে আসিয়া মাল খরিদের সুযোগ না দিয়া বিনা খরচায় (Free delivery) লরী কিংবা গাড়ীতে মাল বোঝাই দিয়া খরিদ্দারের দোকানে পৌঁছাইয়া দিতেছে। নিজেদের লাভের অংশ কমাইয়া ফেলিয়া পরস্পরের খরিদ্দার ভাঙাভাঙি চলিতেছে। বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের দিনে যে যত বেশী ধারে মাল ছাড়িতে পারে, খরিদ্দার তাহার কাছেই তত বেশী জড় হইতেছে। ব্যবসায়ীদের কোন সঙ্ঘ না থাকায় এইপ্রকার প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া অনেক ব্যবসায়ীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। অবিলম্বে ইহার একটা প্রতিকার না হইলে, ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকা সকলের পক্ষে শক্ত হইবে।

সঙ্ঘ (Association)

কোন কোন ব্যবসায়ীদের মধ্যে সঙ্ঘ (Association) আছে বটে, কিন্তু তাহার ভিতরেও অনেক গলদ। কাগজে-কলমে সঙ্ঘের নিয়ম মানিয়া চলিলেও খরিদ্দার-ভাঙ্গাভাঙ্গির জন্য ভিতরে ভিতরে সকলেই খরিদ্দারকে সুবিধা প্রদান করেন।

এই সমস্ত প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, ব্যবসায়ীদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সঙ্ঘের কার্য্য শুধু প্রস্তাব, অনুমোদন, সমর্থন প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত থাকিলে চলিবে না, চাই সর্ব্বাগ্রে তাহাদের মনের পরিবর্ত্তন। নতুবা উহা প্রহসনে পরিণত হইবে।

১৩৪৫ সালের ৯ই আষাঢ় তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।

"গত বুধবার অপরাহ্নে এলবার্ট ইনষ্টিটিউট্ হলে কলিকাতা পোষাক ও বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতির একটি অধিবেশন হয়। সমিতির সহকারী-সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কলিকাতার বিভিন্ন বাজারের পোষাক ও বস্ত্রব্যবসায়ীরা সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রম ও বাণিজ্য-বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় বঙ্গীয় দোকান নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি বিল আনয়নের পরিকল্পনা করিয়াছেন। উক্ত বিল সম্বন্ধে সমিতির সুচিন্তিত অভিমত নির্ণয়ের জন্য সভার বিশিষ্ট কয়েকজন সভ্য লইয়া একটী সাব-কমিটী গঠন করা হয়।"

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যবসা সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত না থাকিলেও, ঐ সম্বন্ধে এই পুস্তকে যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহা সত্য। পোষাক ও বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যে প্রতিযোগিতার ঠেলায় পড়িয়া এই জাতীয় বিল কাউন্সিলে পাশ করাইবার চেষ্টায় আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাঙালী ও অ-বাঙালীর মধ্যে

শ্রম ও শিক্ষা

সস্তায় বিদেশী-শিল্প দ্রব্যের আমদানি বন্ধ না হইলে, অল্প মূলধন খাটাইয়া বাংলায় কোন শিল্প-আবিষ্কারে ব্যবসায়ের চেষ্টা করা বৃথা। উহাতে মূলধন নষ্ট হইবে। 'বেকার থাকা অপেক্ষা বেগার দেওয়া ভাল', এই হিসাবে শ্রমের কোন মূল্য না ধরিয়া ঘরে বসিয়া কোন প্রকার কুটীর-শিল্প দ্বারা কিছু উপার্জ্জন ভিন্ন বিদেশী-যন্ত্রচালিত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অন্য কোন প্রকার শিল্প-ব্যবসায় বর্ত্তমানে চলিতে পারে না। গত ১৯৩৬ সালে খুলনা ও ২৪ পরগণার দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র শ্রেণীর অনেক লোক নোনা মাটি সংগ্রহ করিয়া নোনা জলের সহিত জ্বাল দিয়া লবণ তৈয়ারী করিত, উহা ১৲, ১।০ প্রতিমণ বিক্রয় করিয়া একদিন অন্তর একদিন খাইয়া তাহারা জীবনধারণ করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের দৈনিক।/০, ।৵০ আনার অধিক উপার্জ্জন হইত না। ইহাতে পরিশ্রমের মূল্যও তাহারা পাইত না। কারণ জল জ্বালাইয়া লবণ প্রস্তুত করিতে তাহারা বিনা পয়সার শুষ্ক বাঁশের পাতা, কলার পাতা, খড়, বিচালি প্রভৃতির সাহায্য লইত। কাঠ কিংবা কয়লা খরিদ করিলে খরচ পোষায় না। উহাতে তাহাদের বাঁচিয়া থাকা ছাড়া শ্রমের আর কোন মূল্য ছিল না।

চীনা

পল্লী অঞ্চলের বহু বেকার তাস পাশা খেলিয়া, সময় নষ্ট করে; কিন্তু চীনারা দিনের একটি মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করে না। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাহারা কদাচ হাতের কাজ ফেলিয়া গল্প-গুজব

করে না। তাহাদের কি পুরুষ, কি নারী মৌমাছির মত পরিশ্রমী। কলিকাতার চীনারা জুতা ও চামড়ার ব্যবসায়ে বৎসরে এককোটী টাকার উপর রোজগার করে। চীনা ছুতারগণ এক এক টাকায় একখানি সুন্দর চেয়ার বিক্রয় করিয়াও বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। চীনাদের অধীনে যে-সকল হিন্দুস্থানী মুচী কাজ করে, তাহারা দৈনিক ৸৹, ৸৵৹ আনা রোজ পায়। বাঙালীরা এই সমস্ত কাজ শিক্ষা করিলে দোষ কি ?

শ্রমের মর্য্যাদা

বিখ্যাত পাদ্রী উইলিয়াম কেরী সাহেব এক সময়ে চর্ম্মকারের কাজ করিতেন ; নব-রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিনেতা জোসেফ ষ্ট্যালিন্ তাঁহার দারিদ্র্যের দিনে করিতেন মুচীর কাজ। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রিডিং প্রথম যখন ভারতে আসেন, "কেবিন বয়" (Cabin boy) হইয়া আসিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বারে আসেন্ 'ভাইস্‌রয়' হইয়া। এতদিন অলসভাবে জীবন-যাপনের ফলে বাঙালী অধ্যবসায়-হীন ও শ্রমকাতর হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী হইয়া বাঙালী যুবক শ্রমের-মর্য্যাদা ভুলিয়াছে—হীন কাজে তাহার অপমান বোধ হয়। কাজের দিক্ হইতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এইভাবে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে কাজ করিতে পারে, শিক্ষিত গ্রাজুয়েট্‌রা তাহা পারেন না—তাঁহাদের সম্মানহানি হয়। মানের দায়ে তাই অনশনকেই তাহারা বরণ করিয়া লন। তথাকথিত হীনবৃত্তি অবলম্বনে যেখানে মাসে ৩০৲ টাকা রোজগার হয়, সেখানে টেবিল-চেয়ারে বসিয়া যদি ১০৲ টাকা রোজগার হয় সে চাকুরীতেই ইহারা সম্মান বোধ করেন। আমাদের দেশে একটি কথা আছে,—'মানের গোড়ায়

ছাই না দিলে মান বাড়ে না'। এখানে 'মান' অর্থে—মানকচু। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানকচুর চাষ করিতে হইলে উহার গোড়ায় ছাই দিলে, সেই কচু একদিকে যেমন বড় হয়, তেমনি খাইতেও হয় সুস্বাদু। বর্ত্তমানে বাংলার বেকার-সমস্যা যেরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় মানের গোড়ায় ছাই দিয়া বাঙালীকেও যে-কোন কাজে লাগিতে হইবে। হয়তো তাহাতেই জীবন একদিন উপভোগ্য হইয়া উঠিবে। কে বলে বাংলায় কাজের অভাব? কাজের অভাব নয়—কাজীরই অভাব। দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিয়া এখানে করিয়া খাইতেছে, আর বাঙালী যে তাহার নিজের দেশে কাজের অভাবে অনাহারে মরিতেছে—আমি বলি, ইহা তাহার পরাজয়েরই পরিচয়।

কাজ! কাজ করে কে? বাঙালী ব্যর্থ চাকুরীর চেষ্টায় কিংবা গল্প করিয়া আড্ডা দিয়া সমস্ত দিন কাটাইবে, অথচ কয়েক ঘণ্টা বিড়ি বাঁধিয়া যদি এক আনা রোজগার হয় তবে তর্ক করিবে,—"শ্রমের মূল্য পোষাইল না"! এদিকে ৪।৫৲ টাকার একটা টিউশনির জন্য কিন্তু উমেদারের অন্ত নাই। ঘরে বসিয়া ২।৩ ঘণ্টা বিড়ি বাঁধিলে কিন্তু ঐ ৪।৫৲ টাকার সমস্যা অবাধেই মিটিতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে একটা কাজেরও অভিজ্ঞতা জন্মে। হয়ত ইহার ভিতর দিয়াই একদিন একটি মস্ত কারখানাও সৃষ্টি হইয়া যাইতে পারে। চাই অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ের বলে সামান্য জুতা প্রস্তুত হইতেও যে একদিন কেহ বড় জুতা-ব্যবসায়ী হইতে পারিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে! টিউশনিই কর, আর চাকুরীই কর, তাহাতে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার কিছু নাই, পক্ষান্তরে মনিবকে সন্তুষ্ট করিয়া চাকুরী বজায় রাখিতে অনেক সময় নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিতে হয়—বিসর্জ্জনও দিতে হয়। অতি অকিঞ্চিৎকর পান,

বিড়ি, সোডা, লিমনেডের দোকান করিয়া যে পেট চালায়, তাহার ভিতরে আত্মনির্ভরশীলতার যে-স্বাধীন মনোবৃত্তিটি বিকশিত হইয়া উঠে, একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর মধ্যেও তাহার বিকাশ দেখা যায় না। স্বাধীনভাবে পরিচালিত নগণ্য কার্য্যের ভিতর দিয়াও মানুষের সাহস, উদ্যম, আত্মনির্ভরতা ও নব নব বিষয়-উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ হয়। জগদ্বিখ্যাত জুতা-ব্যবসায়ী মিঃ বাটা একজন সামান্য গ্রাম্য মুচির ছেলে। বাল্যজীবনে তিনি লোকের বাড়ী বাড়ী জুতা বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। এক্ষণে তাঁহার কারখানায় দৈনিক ১ লক্ষ ৬০ হাজার জোড়া জুতা প্রস্তুত হয় এবং কাজ করে ১৭ হাজার লোক। সম্প্রতি লুঙ্গিতে বাটার যে কারখানা সৃষ্টি হইয়াছে, উহাতে ১০।১৫ টাকার চাকুরীর আশায় প্রত্যহ কত লোক যে দরজায় ধর্ণা দিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মূলপ্রশ্ন

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে এত অবাঙালীর দল আজ বাংলায় বাজার জাঁকিয়া বসিয়াছে, খবর লইলে দেখা যায় ইহাদের অধিকাংশেরই সাহস, পরিশ্রম ও স্বাভাবিক ব্যবসা-বুদ্ধি ছাড়া অন্য পুঁজি নাই; এই সম্বল লইয়াই তাহারা সমগ্র বাংলা জুড়িয়া ব্যবসায় করিতেছে। এই সকল অ-বাঙালীরা যেমনি কঠোর শ্রমশীল, তেমনি আবার মিতব্যয়ী ও সরল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। সামান্য ফেরীওয়ালা হইতে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেও মূলধন বৃদ্ধি করাই থাকে ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বাঙালীদের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা এত কষ্ট-সহিষ্ণু নহে। অধিকন্তু তাহারা কোন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াই, উহা হইতে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য মূলধন, কোথাও কোথাও বা মহাজনের টাকা পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া কারবারের সর্ব্বনাশ করে। কোন কোন স্থলে

শুধু নিজের পশার-প্রতিপত্তি জাহির করিতে গিয়াও বাঙালীরা আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে না পারিয়া ব্যবসা নষ্ট করিয়া বসে। ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যে কাজই করুক না কেন, যদি মূলধন সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য না থাকে, সে ব্যবসায়ের ধ্বংস অনিবার্য্য।

বাঙালী যুবকরা ব্যবসা-শিক্ষার কথা উঠিলেই বলিয়া থাকে, "মূলধন কোথায়? আর মূলধন না থাকিলে ব্যবসায় শিখিয়াই বা কি করিব!" কিন্তু যাহাদের ব্যবসায়-পরিচালনের যোগ্যতা থাকে, তাহাদের মূলধনের কদাচ অভাব হয় না। প্রচুর পরিমাণ মূলধন ফেলিয়াও শুধু যোগ্যতা অভাবে অনেককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বহু উল্লেখ করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যবসায়ের নিম্নস্তর হইতে কাজ আরম্ভ করিয়া যাহারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে, তাহারাই পাকা ব্যবসায়ী হয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবার

বাঙালী শ্রমকাতর ও আয়েসী হইয়া পড়ায়, অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবার ক্রমেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এরূপ অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায়, দুই একজন রোজগার করে, আর ৭।৮ জনে বসিয়া খায়। যাহারা বেকার থাকে তাহাদের দ্বারা সংসারের কোন প্রকার সাহায্য হয় না। অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম না হইলেও তাহারা অন্যভাবে পরিবারের সহায়তা করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহস্থের নিত্য-প্রয়োজনীয় তরি-তরকারী উৎপন্ন করিয়া, গো-পালনের দ্বারা দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া এবং জ্বালানী কাষ্ঠ প্রভৃতি অনেক জিনিষ যোগাইয়া তাহারা পরিবারের সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু তাহা তাহারা করে না। বরং যাহার হাতে সংসার-খরচের ভার থাকে, অনেক সময় তাহা হইতে সে কিছু আত্মসাৎ করিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে মন-ভাঙ্গাভাঙ্গির কারণ ঘটিয়া একান্ন-

বর্ত্তী পরিবার পৃথক্ হইয়া পড়ে। তখন কিন্তু কেহ পরিশ্রমে কাতর হয় না। সকলেই আপন আপন পরিবার প্রতিপালনে স্বাবলম্বী হইতে যত্নবান হয়। পূর্ব্বে যৌথ-পরিবার মধ্যে কেহ অর্থ দ্বারা, কেহ পরিশ্রম দ্বারা, নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী সংসারের সাহায্য করিত; বর্ত্তমানে সে-মনোবৃত্তির অভাব ঘটিয়াছে। কাজেই একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যাহারা বেকার, বসিয়া খাওয়াই পেশা, তাহারা উহাকে তাহাদের একটি দাবী বলিয়াই মনে করে; এজন্য তাহারা একটুও কৃতজ্ঞ নহে। বরং উপার্জ্জনকারীর দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, অথচ পৃথাগন্ন হইলে সংসারের কোন উপায়ক্ষম ব্যক্তির নিকট হইতে সামান্য কিছু সাহায্য পাইলেও তাহাই উপকার বলিয়া মনে করে। যৌথ-পরিবারের উপায়ক্ষম ব্যক্তিটি যেন ষ্টেসনের কুলী। কোথাও যাতায়াতের সময় বাবুরা কুলীর ঘাড়ে 'বেডিং, সুটকেশ' প্রভৃতি সমস্ত বোঝা চাপাইয়া দিয়াও যদি তাহার হাত খালি দেখিতে পান, তাহা হইলে নিজের হাতের ছাতাটি পর্য্যন্ত তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া শূন্য হাতে ধমক দিতে দিতে যেমন সঙ্গে সঙ্গে চলে, তেমনি একান্নবর্ত্তী সংসারের উপায়ক্ষম ব্যক্তিটির ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দিয়া, অন্যান্য সকলেই তাঁহার কোন দোষ-ত্রুটী থাক বা না থাক, টিপ্পনী করিতে ছাড়েন না।

বাঙালী শ্রম-বিমুখ, আয়েসী, ও অসাধু হইয়া পড়ায়, বেকার-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহারা যদি পশ্চিমা খোট্টা ও চীনাদের আদর্শে পরিশ্রম করিয়া নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারে, তবে অনাহারে মৃত্যু ছাড়া বাঙালীর আর গত্যন্তর নাই।

অ-বাঙালীর শিক্ষা

কলিকাতার জনৈক অ-বাঙালী ব্যবসায়ীর ১২,১৩ বৎসরের একটি

ভ্রাতুষ্পুত্র দেশ হইতে কলিকাতায় আসে। তাহাকে উক্ত ব্যবসায়ী নিজের কারবারের মধ্যে কোন প্রকার কাজকর্ম শিক্ষা করিতে না দিয়া একখানি কড়াই, একটি চুল্লী, ও নগদ চারি আনা পয়সা পুঁজি দিয়া, উহার দ্বারা ছোলা, বুট খরিদ করিয়া, তাহা ভাজিয়া ফেরী করিতে উপদেশ দিলেন। আমার জনৈক বন্ধু উক্ত ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার লক্ষ টাকার কারবার, কত কত লোক সেখানে কাজ করিতেছে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাহাতে কোন কাজে নিযুক্ত না করিয়া এরূপ উঞ্ছবৃত্তি করিতে দিলেন কেন?" ব্যবসায়ীটি উত্তর দিলেন,—"আজ যদি উহাকে নিজের কারবারের মধ্যে নিই, তবে এই সমস্ত টাকা-কড়ি দেখিয়া উহার মাথা বিগড়াইয়া যাইবে। কষ্ট-সহিষ্ণুতাও শিখিবে না কিংবা টাকার দরদও বুঝিবে না। বরং খরচ-পত্রে অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িবে। উহাকে চারি আনা পুজি দিয়া ভুঁজা ফেরী করিতে দিয়া আজ ।০ আনায় যদি উহার ৵১০ লাভ হইয়া ।১০ পয়সা পুঁজি দাড়ায়, তবে উক্ত লাভকে সে গায়ের রক্ত স্বরূপ মনে করিবে। এইভাবে যখন তাহাকে অর্থ সঞ্চয়ের নেশায় পাইয়া বসিবে, মিতব্যয়িতার শিক্ষালাভ হইবে, তখন তাহাকে গামছা কিংবা অন্যান্য জিনিষ ফেরী করিতে দিয়া পরে এই কারবারে লইব।" অ-বাঙালীরা বালকদিগকে এইভাবে শিক্ষা দিয়া কষ্ট-সহিষ্ণু ও মিতব্যয়ী করিয়া তোলে। কিন্তু বাঙালীর রীতি-নীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

জীবন-যাত্রায় বাঙালীর কর্ত্তব্য

অভাবের তাড়নায় বাঙালী যে কি শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সহরে বসিয়া তাহা অনুমান করা যায় না। পল্লীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়—কি নিদারুণ দারিদ্র্য দেশকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। গৃহে গৃহে হাহাকার! মুখে হাসি নাই, অন্তরে সজীবতা নাই,—বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই যেন এক একটি নৈরাশ্যের ছবি। এ অবস্থার প্রতিকার না করিলেই নয়। কিন্তু উপায় কি, কর্ত্তব্য কি—"কঃ পন্থা?"

মিথ্যা-সম্মানবোধ পরিহার

সর্ব্বাগ্রে মিথ্যা সম্মানবোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। একমাত্র মেধাবী ছাত্র ছাড়া অপর কাহারও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রির পিছনে ছুটিবার প্রয়োজন নাই। জানি, এ মোহ আজও বাঙালীকে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু "এ মায়া ছাড়িতে হ'বে।" যে সকল অভিভাবক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষা দেন, তাঁহাদের উচিত সেই টাকাটা ঐভাবে ব্যয় না করিয়া হয় কোন অর্থকরী শিক্ষায়, কিংবা কোন ব্যবসা বা কৃষি শিক্ষায় ব্যয় করা। বি,এ, এম,এ পাশ করিয়াও যখন ২৫।৩০৲ টাকার চাকুরী জুটিতেছে না, তখন না হয় উচ্চ-শিক্ষার পিছনে যে টাকাটা ব্যয় হইত সেটা তাহারা ব্যবসা করিতে গিয়া নষ্টই করিল; সেও লাভ। কারণ তাহাতে তাহাদের কৃষি বা ব্যবসায় সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা জন্মিবে। বি,এ, এম,এ পাশ করিলে তো একমাত্র কেরাণীগিরি ছাড়া আর কোন অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। বরং তাহাতে এত বেশী আত্মসম্মানবোধ জন্মে, যে ইহাদের পক্ষে নিম্নস্তরের

কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। আর বি,এ, এম,এ পাশই যে শিক্ষার মাপকাঠী ইহা মনে করা ভুল। বরং ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়া অর্থ-নীতি, বাণিজ্য-নীতি, কৃষিতত্ত্ব, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিলে অনেক ছাত্রের যে অভিজ্ঞতা-লাভ হইবে, তদ্দ্বারা হয়তো কর্মক্ষেত্রে তাহাদের একটা পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয়, এই জাতীয় শিক্ষাই সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও কার্য্যকরী। কারণ এ বিষয়ে সকলেই একমত হইবেন যে, বাংলা দেশের ছাত্রগণের পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে সাধারণ-জ্ঞান অতি কম। বাংলার প্রত্যেক পল্লীগ্রামের অন্ততঃ কতকগুলি ছাত্রকেও যদি এই আদর্শে তৈরী করা যায়, এবং তাহার মধ্যে কয়েকটি যুবকও যদি জীবন-যুদ্ধে সফলতা লাভ করিতে পারে, তবে ক্রমশঃ ইহা সকলকেই উৎসাহিত করিবে।

অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা তুলিতে চাই। পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদের হোষ্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়িতে হয়। ইহার একটা পরোক্ষ কুফল আছে। সহরের চাকচিক্যময়ী সভ্যতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাত্রা মনের উপরে তাহাদের এমনি ভেলকি লাগাইয়া দেয় যে, পল্লী-অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মাথা বিগড়াইয়া যায়। ক্রমশঃ তাহারা অমিতব্যয়ী ও সহরবাসীর আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের পক্ষে পল্লী-জীবন-যাপন অসহ্য হইয়া উঠে।

যদিও বর্ত্তমানে চা-পান পল্লী-অঞ্চলেও সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে, তথাপি এখনও অনেক বাড়ীতে উহার ছোঁয়াচ লাগিতে বাকী আছে। কিন্তু এই সব পরিবারের ছেলেরাও কলিকাতার হোষ্টেলে আসিয়া

-যেই ঢুকিল অমনি চায়ের নেশায় তাহাদের পাইয়া বসে। পল্লীগ্রামে থাকিয়া যাহারা নিজের কাপড় নিজে কাটিত, কলিকাতায় হোষ্টেলে ঢুকিয়া তাহাদের সে অভ্যাসও যায়। তারপর অচিরেই তাহারা এমন অলস বাবু হইয়া পড়ে যে, ভবিষ্যৎ-জীবনে তাহাদের দ্বারা শ্রমসাধ্য আর কোন কাজ হইবার উপায় থাকে না। কবি রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলিয়াছিলেন, "পরের দ্বারে ধর্ণা দিলে স্বরাজ হয় না—**আত্মশক্তি, আত্ম-নির্ভরতা থাকা চাই**।" কিন্তু আত্ম-শক্তি, আত্ম-নির্ভরতা কোথায়? উচ্চ-শিক্ষিত হইতে গিয়া যুবকেরা ঐ সকল শক্তি এমন ভাবে হারাইয়া ফেলে যে, একমাত্র কেরাণীগিরি ছাড়া তাহাদের দ্বারা আর কোন কাজ চলে না। স্বাস্থ্যতো অনেকেরই নাই—চা-পান অভ্যাসের ফলে অল্পবিস্তর সকলেরই অজীর্ণ রোগ। পরিশ্রমের অভ্যাস না থাকার দরুণ প্রায় সকলেই অলস। নিজেদের অবস্থা গোপন করিয়া ধনী সন্তানদের সহিত সমান তালে চলিতে গিয়া অনেকেই অমিতব্যয়ী। কিন্তু অভিভাবকগণ তাহাদের মানুষ করার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কি কষ্টে যে তাহাদের টাকা যোগাইয়া থাকেন, এ চিন্তা তাহাদের মনেও আসে না। আমাদের ছেলেদের যদি মানুষ করিতে হয়, তবে বর্ত্তমান জীবন-যাত্রার প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বাংলার আশা-ভরসা তরুণ বন্ধুদের তাই আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—

"বন্ধুগণ, চা ছাড়। তাহার পরিবর্ত্তে বরং গরম জলে খানিক পাতি-লেবুর রস মিশাইয়া খাও। কিংবা ঘোলের সহিত বিট্ লবণের গুঁড়া মিশাইয়া খাইতে পার, অজীর্ণ দূরীভূত হইবে। উহার সঙ্গে কৃষ্ণ-তিল দিলে আরও ভাল হয়। বিস্কুটের পরিবর্ত্তে চিড়া, মুড়ি, গুড়, আদা, ছোলা প্রভৃতি জলখাবার খাও। তাহাতে 'ভাইটামিন' আছে।" কলিকাতায় টমেটো সুলভ উহাতে ভাইটামিন্ও যথেষ্ট। ইহার ২।৪টা প্রত্যহ কাঁচা খাওয়া উচিত। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই

ইহার চাষ করা চলে। সাহেবেরা ইহা প্রত্যহ খাইয়া থাকে। ভাতের সহিত গরম মশলা-বিহীন ডাল, শাক, তরকারী প্রভৃতি খাইতে হইবে। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে যাহা উপযোগী বাছিয়া বাছিয়া সেই সমস্ত খাদ্যই খাওয়া উচিত। যাহা কিছু খাই, তাহার ভালমন্দ বিচার করি আমরা রসনা-পরিতৃপ্তির দিক্ দিয়া; কিন্তু খাদ্যের সহিত যে স্বাস্থ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। আমার মনে হয়, আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদে আমাদের আবার প্রাচীন-যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আজি হউক, কালি হউক, আমাদের 'হাল ফ্যাসন' বর্জ্জন করিতেই হইবে। তাহাতে ব্যয় কমিয়া যাইবে—শারীরিক শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে।

সামাজিক চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন

সামাজিক কয়েকটি ব্যাপারেও চিন্তাধারা পরিবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়াছে। চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিতে হইবে। বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্ব আসিলে দেশরীতি অনুসারে পোলাও কালিয়া খাওয়াইতে হয়, না হলে মান থাকে না, কারণ তাহাতে তাঁহাদের নিকট দীনতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ মনোভাব ত্যাগ করা অতি প্রয়োজন—এবং এই আদর্শ-প্রদর্শনের জন্য সমাজে কতকগুলি সাহসী ও শক্তিসম্পন্ন লোকের আবশ্যক। কিছুদিন ধরিয়া যদি এই আদর্শের প্রচার (propaganda) হয়, ক্রমশঃ দেশের মতি-গতি ও রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। আমরা যখন চা-পান অভ্যাস করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই কোন আদর্শ হইতে করিয়া-ছিলাম। তখন আমরা এ ভুল ধরিতে পারি নাই যে, ইহা আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। এখন সে ভুল বুঝিয়াছি; কাজেই ঐ কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অর্থ ও স্বাস্থ্য বাঁচাইতে হইবে। চায়ের ব্যবস্থা রাখিতে এক এক গৃহস্থের বাড়ীতে

কম ব্যয় হয় না। দেশে যখন যে রেওয়াজ আসিয়াছে, কোন গুণাগুণ বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমরা কোল দিয়াছি। চীনারা এত বড় আফিমের নেশা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, আর আমরা এই সামান্য নেশা ছাড়িতে পারিব না! বাঙালী বড় অনুকরণ-প্রিয় জাতি। আমাদের ভিতরে যতগুলি কু-অভ্যাস ঢুকিয়াছে, তাহার সবই প্রায় অন্যের নিকট ধার করা। দেশের যুবকদের একদল যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান ফ্যাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করে, এবং সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার করে, তাহা হইলে ক্রমশঃ সুফল ফলিবে। এই আন্দোলনে অর্থের প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল সাহস ও শক্তির। কলিকাতার কলেজ-হোষ্টেলের যুবক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যদি প্রথম এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে বাংলার পল্লীতেও ইহার সুফল ফলিবে। কারণ, বলিতে গেলে তাহাদের দ্বারাই পল্লীঅঞ্চলে এই রোগ সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে, আবার তাহাদেরই চেষ্টায় ইহা দূরীভূত হইতে পারে।

অনাড়ম্বর পোষাক-পরিচ্ছদ

আহার-বিহার সম্বন্ধেও যেমন সংযত হইতে হইবে, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও বাঙালীকে তেমনি সংযত হইতে হইবে। পোষাক-পরিচ্ছদে সংসারের এক একটি লোকের জন্য অন্ততঃ ২৫।৩০৲ টাকা বছর ব্যয় হয়। উহাকে যতদূর সম্ভব সহজ ও সাদাসিধা করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। খদ্দর পরিতে যদি অসুবিধা হয়, অন্ততঃ বাংলা দেশের মিলের তৈরী কাপড়-জামা খরিদ করিতে হইবে। তাহাতে বাংলার মিলগুলি শীঘ্রই উন্নত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে ভারতের সব প্রদেশবাসীরাই "Domicile" প্রশ্ন তুলিয়াছে, এমন কি আসামে পর্য্যন্ত 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে।

সকল প্রদেশের লোকেরই যখন নিজ নিজ প্রদেশের প্রতি এত আসক্তি, বাঙালীর তাহা থাকিবে না কেন ? নিজেরা তুলার চাষ করিয়া তাহা হইতে নিজেরা বাড়ীতে সূতা কাটিয়া, ঐ সূতায় কাপড় প্রস্তুত করিয়া পরিতে না পারিলে খদ্দরেও মনের তৃপ্তি হয় না। বাজারে যে সমস্ত খদ্দর বিক্রয় হয়, তাহা দেশী কি বিদেশী বুঝা যায় না। কাজেই বেশী দামে বাজারের খদ্দর কিনিয়া দেশের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা আমিও সমর্থন করি না। যাহা সহজ ও কার্য্যকরী এবং বরাবর যাহার স্থায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভব, তাহা লইয়াই মাতামাতি করা শোভন, কেবল হুজুগে মাতিয়া কিছু করা ঠিক নহে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ফলেই এ যাবৎ বাংলার কোন আন্দোলন স্থায়ী ও সফল হয় নাই।

অভাবের তাড়নায় লোক এখন সস্তায় জীবনযাত্রার দিকে ঝুঁকিয়াছে। দেশের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় যদি সরল সহজ জীবন-যাত্রার সপক্ষে প্রচারকার্য্য করে তাহা হইলে দেশের অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই বাঁচিয়া যায়।

বাঙালী 'অসাধু', বাঙালী 'ফাঁকিদার', এই সব বিশেষণেই বাঙালী আজ অভিহিত হইতেছে। ইহার কারণ কি ? কারণ 'অভাব'। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট', অভাবের তাড়নায় সাধুও অসাধু হইয়া পড়ে। জীবনযাত্রা যদি অনাড়ম্বর হয়, অভাবও স্বভাবতঃ অল্প হইবে, মানুষের মনের হীন প্রবৃত্তিগুলিও সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

বিবাহ-ব্যাপারেও বাঙালীর বড় ব্যয়-বাহুল্য। একে ত পাত্রীর অভিভাবককে বহুকষ্টে সাধ্যাতীত বরপণ দিতে হয় ; তৎপরে বরের বহু আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের ঠেলায় পাত্রীপক্ষের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় যদি একটু উদারতা-সম্পন্ন হন, ইহার প্রতিকার হইতে পারে।

বাংলার পল্লীচিত্র

কলিকাতা বা বাংলার বড় বড় সহরাঞ্চলের বৃহৎ সৌধরাজি দেখিয়া বাংলার আসল অবস্থা অনুমান করা চলে না। কলিকাতার মত সহরে একই বাড়ীর দুই অংশে দুটি গৃহস্থ দশ বৎসর কাল বাস করিয়াও কেহ কাহারও অবস্থার খবর জানে না। দেশ-বিদেশের নানা শ্রেণীর নানা-ভাষাভাষী এখানে একত্রিত হইয়াছে। রাস্তায় বাহির হইয়া গাড়ী-ঘোড়া চাপা না পড়িলেতো বাপের পুণ্য! অন্ততঃ পাঁচ মিনিট অপেক্ষা না করিলে মোটর-গাড়ীর ঠেলায় কোন একটি রাস্তা পার হওয়া অসম্ভব। ফুটবল-মাঠে ও বায়স্কোপের টিকিট-ঘরের সম্মুখে জনসমুদ্র দেখিয়া কেহ বুঝিতেও পারিবে না—এখানে দারিদ্র্য বলিয়া কিছু আছে। এই গ্রন্থকারের দেশের একটি ধোপার মেয়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে একবার কলিকাতায় আসিয়া বলিয়াছিল—'আমার কপালে একটু আঁচড় * ছিল, তাই স্বর্ণপুরী কলকেতা দেখলাম, দেশের রাজ্যির টাকা আর ইট সবই কি কলকেতায় গাদা হয়েছে!" কথা মিথ্যা নয়।

আবার এখানে ধনীর সংখ্যা যেমন, ভিখারীর সংখ্যাও তেমনি। তার মধ্যে আবার অনেক পেশাদারী ভিক্ষুক আছে। এই জন্য প্রকৃত ভিক্ষুক বাছিয়া লওয়া শক্ত। কলিকাতায় ভিখারীর 'সরদার' আছে। কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে কাঙালী ভোজন করাইতে হইলে সরদারের মারফতে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এজন্য সরদার একটা কমিশন পায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীটে এক ভিখারী-সরদারের পুত্রের বিবাহে যে 'প্রোসেসন' দেখিয়াছিলাম, এরূপ

---

* পুণ্যভাগ্য।

প্রোসেসন পল্লীগ্রামে অনেক জমিদার-বাড়ীর ক্রিয়াকাণ্ডেও দেখা যায় না। কাজেই এই চাকচিক্যময়ী কলিকাতা-নগরীর অবস্থা দেখিয়া বাংলার অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। কবির ছন্দেও এই কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"পর দীপমালা নগরে নগরে।
তুমি যে তিমিরে, সে তিমিরে॥"

বাংলার যাঁরা বড় বড় জমিদার তাঁহারা সকলেই কলিকাতাবাসী। দেশের নায়েব-গোমস্তার উপর কড়া হুকুম চালাইয়া কলিকাতায় টাকা আনিয়া তাঁহারা সহরের আরাম-বিলাস উপভোগ করিয়া থাকেন। ওদিকে কর্ম্মচারীরা জমিদারের হুকুম তামিল করিতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজার রক্ত শোষণ করিতেছেন। আজ যদি আমাদের এই সব জমিদার-শ্রেণী দেশে বাস করিয়া কলিকাতার আরাম-বিলাসে ব্যয়িত টাকাটা দেশের মধ্যে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে পল্লীর স্বাস্থ্য, পথঘাট প্রভৃতির সংস্কার হইয়া তাহার শ্রী ফিরিয়া যাইত। প্রজারাও ইহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইত।

মধ্যবিত্ত তালুকদার গাঁতিদার

এই সম্প্রদায়ের হয়তো কলিকাতাবাসী হইয়া আরাম-বিলাস উপভোগের মত আর নাই। তজ্জন্য ইঁহারা দেশে থাকিয়া নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া স্বরিকগণের সহিত পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসায় ব্যস্ত আছেন। যৌথ-সম্পত্তি পরিচালনে ইহাদের পরস্পরের মতের মিল নাই। সাধারণ স্বার্থ (common interest) রক্ষায় ইঁহাদের বুদ্ধির অভাব। তজ্জন্য উক্ত পরিবারের কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন, 'পূর্ব্ব জন্মের বহু পাপ না থাকিলে, কেহ বহু স্বরিকের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করে না।' যৌথ-সম্পত্তির স্বরিকগণের মধ্যে যদি কেহ সৎপরামর্শ দিতে যায়, অপরাপর স্বরিকগণ মনে করে, এ লোকটীর নিশ্চয়ই ইহাতে

কিছু স্বার্থ আছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

কোন এক পরিবারে /৪ পাই অংশের জনৈক স্বরিক একটি যৌথ-সম্পত্তির জলকর বার্ষিক ৯০৲ টাকায় বিলি-বন্দোবস্তের জন্য জনৈক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিলে অন্যান্য স্বরিকগণ সন্দেহ করিলেন যে, হয়তো ইহার মধ্যে তাঁহার কিছু ঘুষের ব্যবস্থা আছে; তজ্জন্য কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিলেন, "উক্ত জলকর বিলির জন্য হাটে-বাজারে ঢোল্ পিটাইয়া দেওয়া হউক। যাহার দর বেশী পাওয়া যাইবে, তাহাকেই বিলি করা হইবে।" কিন্তু যিনি পূর্ব্বপ্রার্থীর জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি অপরাপর স্বরিকগণের মনোভাব ও কার্য্য-ক্ষমতা বিশেষভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি উক্ত প্রার্থীর নিকট হইতে গোপনে ৯০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন—"যাও, তুমি গিয়া উক্ত জলকর দখল কর, পরে যাহাই হউক আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।" এদিকে এক বৎসরের মধ্যে অন্যান্য স্বরিকগণ ঢোল পিটাইয়া জলকর বন্দোবস্তের কোন চেষ্টাই করিলেন না। কাজেই উক্ত স্বরিকের /৪ পাই অংশের প্রাপ্য ৭৷৷০ স্থলে ৯০৲ টাকা লাভ হইয়া গেল। পরস্পরের প্রতি অনাস্থার জন্য এই ভাবে যৌথ-সম্পত্তি ধ্বংস হইতেছে। তদুপরি বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের দিনে প্রজার নিকট হইতে যথাসময়ে খাজানা আদায়ও হয় না। ইহার উপর সম্প্রতি আবার প্রজারা ঋণশালিশী বোর্ডের আশ্রয় লইতেছে। কাজেই পল্লীর ঐ সমস্ত সম্পত্তিশালীরা নির্দ্দিষ্ট দিনে কালেক্টরীর রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া দাখিল করিতে না পারায় প্রায় প্রতি কিস্তিতে তাহাদের সম্পত্তি নীলাম-বিক্রয় হইতেছে। বারোয়ারী পূজারও ২।১ জন কর্ম্মকর্ত্তা থাকে, যৌথ-সম্পত্তিওয়ালাদের তাও নাই। পূর্ব্বপুরুষ-নির্ম্মিত ঠাকুর-দালানের ছাদে গাছ জন্মাইতেছে, জল জমিয়া ছাদ নষ্ট হইয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু কে তাহার

দিকে লক্ষ্য করে? পিতৃপুরুষের প্রকাণ্ড লম্বা দালান ভাগ্-বাঁটোয়ারা করিয়া এক এক স্বরিক এক এক অংশে বাস করে; ছাদ সরকারী। বর্ষার দিনে ফাটা ছাদ দিয়া জল পড়ে, সকলেই কষ্টে দিন যাপন করে, কিন্তু সরকারী তহবিলে টাকা নাই, সরকারী ছাদও মেরামত হয় না। যদি কেহ নিজের অংশ নিজের ব্যয়ে মেরামতের চেষ্টা করে, অপর স্বরিক তাহাতে বাধা দেয়। অজুহাত—একজনের ছাদ মেরামত হইলে অন্যের ছাদে আরও বেশী জল পড়িবে। একজনে সুখে বাস করিবে, অপরে কষ্ট পাইবে, এ জাতীয় হিংসাও ইহার মধ্যে আছে। কাজেই বহু স্বরিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করা যে একটা অভিশাপ—ইহা অস্বীকার করা যায় না।

কোন প্রজা বা খাতকের নামে আদালতে নালিশ হইলে, স্বরিকগণের কেহ হয়তো প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার নিকট কিছু ঘুষ লইয়া সমস্ত মামলাটি নষ্ট করিয়া দেন। কোন কর্ম্মচারীর কাজের হিসাব-নিকাশ দাবী করা হইলে কোন স্বরিক তাহার পক্ষাবলম্বনে তাহাকে হিসাব-নিকাশের দায় হইতে রেহাই দেন। অবিভক্ত যৌথ-সম্পত্তির স্বরিকগণের মধ্যে এ জাতীয় বহু প্রকার অনাচার চলে এবং তাহাতে যৌথ-সম্পত্তি ধ্বংস হয়।

মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়

পল্লী-অঞ্চলে ইঁহারাই বেশী হতভাগ্য। ইঁহাদের মধ্যে বেকারের-সংখ্যাও অত্যধিক। এই সম্প্রদায়ের লোকের কাহারো জমী-জমাও বিশেষ নাই, চাকুরী-বাকুরীও বড় নাই। ইঁহারা না পারেন জন খাটিতে, না পারেন ভিক্ষা করিতে। ইঁহাদের মধ্যে যাহাদের দু'দশ বিঘা খাস-জমী আছে তাহা চাষীকে ভাগে দিয়া ফসলের অর্দ্ধেক মাত্র পাইয়া থাকেন। কাহারও নিষ্কর ব্রহ্মোত্তরের দু'চার ঘর প্রজা থাকিলে

তাহার বড় একটা খাজনা আদায় হয় না। কারণ তাহাদের 'ধার ভার' নাই, অতএব কেহ কথা গ্রাহ্য করে না। ইহাদের আদালতে যাইবারও ক্ষমতা নাই। এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণী সমাজে প্রতিপত্তিহীন। ইহাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, বাড়ী-ঘর মেরামতের অর্থ পর্য্যন্ত নাই। বর্ষায় জল পড়িয়া ঘরের ভিতর ভাসিয়া যায়, সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া কাটে। ঘরে চা'ল নাই, উপবাসে দিন যায়, তবু কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া সেকথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তাতে নিজের হীনতা প্রতিপন্ন হয় ও প্রাণে আঘাত লাগে। দিন চলে ইঁহাদের অতিকষ্টে,—হয় তো বাড়ীর সামান্য কলা, কচু, নারিকেল, সুপারি হাটে-বাজারে বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা দু'চার আনা সংগ্রহ হইলে তাহাতেই কোন প্রকারে ফেনভাত জোটে। আবার যে-সমস্ত লোকের পূর্ব্বপুরুষ-অর্জ্জিত একটু আভিজাত্য আছে, তাঁহারা নিজেরা হাটে-বাজারে গিয়া ঐ সমস্ত মাল বিক্রয় করিতে লজ্জিত হন। কাজেই কোন লোকের সাহায্যে উহা বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু সে যদি উহা হইতে কিছু কমিশন লয়, তাহাতে আপত্তি করার উপায় নাই।

মধ্যবিত্তদের পেশা

এই শ্রেণীর কেহ কেহ মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গোটাকতক ১৫ পয়সা ড্রামের ঔষধ ও ॥০ আনা মূল্যের একখানি চিকিৎসাতত্ত্ব খরিদ করিয়া ডাক্তারী করেন। যাহারা এই সব ডাক্তারের ঔষধ খায়, তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। মাত্র দু'এক আনা এ সব চিকিৎসার দক্ষিণা। তাও যাদের জোটে না, তাহারা হরিবোলা হয়, মাটিপড়া খায়, ঝাড়ফুক্ করায়। এসব চিকিৎসায় কাহাদের রোগ সারে—বাঁচিয়া থাকিয়া যাহাদের দুঃখভোগের মেয়াদ না ফুরায় একমাত্র তাহাদেরই।

এই শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ দোকানদারের খাতাপত্র লিখিয়া দিয়া মাসে ২।১৲ টাকা রোজগার করে। কেহ বা পরের মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া, আদালতে সত্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কখনও কিছু আয় করে। আবার ইহাদের কেহ কেহ নিম্নশ্রেণীর পল্লীতে কাহারও একখানি ঘরে বসিয়া পণ্ডিতি করিয়া থাকে; তাহাতে হয় তো বাহিরের ছাত্র-দত্ত বেতনে মাসে ২।৩৲ টাকা রোজগার হয়। অনেকের হয় তো পয়সা-কড়ি জোটে না, ছাত্র-প্রদত্ত কলা, কচু, মাছ, পান, শাক লইয়াই ঘরে ফিরিতে হয়। কেহ কেহ বা গ্রাম্য সম্পত্তিশালী লোকের প্রজার নিকট খাজনার তাগেদা করিতে পেয়াদা-পাইকের কাজ করিয়া মাসে ৩।৪৲ টাকা বেতন পায়।

এই শ্রেণীর কেহ কেহ আবার ২।৩৲ টাকার ধান্য খরিদ করিয়া বাড়ীর মেয়েদের দ্বারা ঢেঁকিতে চাউল প্রস্তুত করায় এবং প্রতিবাসীদের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া হয় তো দৈনিক ৶০-।০ লাভ করিয়া তদ্দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। অতিরিক্ত বর্ষা-হেতু বা পরিবারের অসুখ-বিসুখে চাউল প্রস্তুত করিতে অক্ষম হইলে পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলে। এই নগণ্য ব্যবসায়ের মধ্যে আবার অনেক সময় প্রতিবাসীর নিকট কিছু কিছু ধার পড়িয়া যায়। অনেক সময় তাহা আদায়ই হয় না, ইহাতেও গরীবের পুঁজি ভাঙ্গা পড়ে। তারপর আজ কাল ব্যবসায়ীরা সস্তায় রেঙ্গুন চাউল আমদানি করায় এই কাজও ভাল চলিতেছে না। এই শ্রেণীর অনাথা বিধবা স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ অবস্থাপন্ন প্রতিবেশীর বাড়ীতে ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া গৃহস্থকে বারো সের চাউল বুঝাইয়া দিলে মজুরী হিসাবে একসের চাউল পায়। তাহাই তাহাদের জীবিকার সম্বল। আজকাল আবার অনেক পল্লীগ্রামে 'ক্রুড অয়েল মেসিন' অর্থাৎ ধানের কল স্থাপিত হওয়ায়, অনেকের এ জীবিকার পথও নষ্ট হইয়াছে।

খুলনা জেলায় সুন্দরবন জঙ্গলের সন্নিকটে বড়দল নামক একটি দ্বীপের মত স্থান আছে। সপ্তাহে প্রতি রবিবারে সেখানে একটি হাট বসে। বাংলা দেশে এত বড় হাট আর কোথাও আছে কিনা অবগত নহি। এই হাটে প্রায় ২০।২৫ হাজার লোকের সমাগম হয়। খরিদ্দার ও ব্যাপারীগণের ৪।৫ হাজার নৌকা আমদানী হইয়া থাকে। এই হাটের চারিধারে চাষী-সম্প্রদায়ের বাস। উহা এক-ফসলের দেশ। একমাত্র ধান্য ছাড়া ঐ অঞ্চলে আর কোন বিশেষ চাষ হয় না। উক্ত হাটের মধ্যে একটি স্থানে 'গুরু-হাটা' ('গো-হাটা' নয়) আছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অল্প শিক্ষিত দুঃস্থ লোকেরা পণ্ডিতগিরি চাকুরীর জন্য প্রতি রবিবার হাটে উক্ত গুরুহাটায় উপস্থিত হন। চাষী-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের পণ্ডিতের আবশ্যক, তাহারা গুরুহাটায় উপস্থিত হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পরীক্ষা করে। প্রশ্নের নমুনা এই প্রকার,—"টাকায় ৫ পালি ৬ কোন * ধান্য হইলে এক শলা ধান্যের দাম কত?" যিনি এই জাতীয় প্রশ্নের ঠিকমত জবাব দিতে পারেন, তিনি পরীক্ষায় পাশ হইয়া মাসে ৫।৬৲ টাকা বেতনে গুরুগিরিতে নিযুক্ত হন। আহার-বাসস্থান অবশ্য তাহারাই দিয়া থাকে, কিন্তু নিজের রান্না করিয়া খাইতে হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের কাজ (duty) ঐ সমস্ত চাষী-সম্প্রদায়ের ছেলে-পড়ানো এবং তাহাদের ধান্য-বিক্রয়ের সময় দর কষিয়া টাকার হিসাব করিয়া দেওয়া। কখন কখন জমিদার-মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহারা যে দাখিলা রসিদ পায়, তাহা ঠিক আছে কিনা গুরুমহাশয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। যিনি উহাতে ভুল করেন, তাঁহার চাকুরী থাকে না। এই প্রবন্ধটি প্রেসে যাওয়ার পর জানা গেল যে, বেকার-সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, গুরু-মহাশয়েরা এখন আর হাটে না বসিয়া চাষী-সম্প্রদায়ের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাকুরী সংগ্রহ করেন। পৌষ-মাঘ

---

* ১৬ কোণে এক পালি। ১ পালিতে /৫ সের। ২০ পালিতে ১ শলা।

মাসে ফসলের সময় কৃষক-সম্প্রদায়ের যখন অবস্থা একটু স্বচ্ছল হয়, তখন তাহাদের বালকদের শিক্ষা দিতে আগ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যখন চাষের ব্যয়ের জন্য তাহাদের টাকার অভাব হয়, তখন গুরুমহাশয়ের চাকুরী থাকে না। বর্ত্তমানে গুরুমহাশয়দিগের আর নগদ টাকায় বেতন স্থির হয় না। পল্লীর যত লোকের ছেলে পড়িবে, মাসকাবারে বস্তা ঘাড়ে লইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া বেতন হিসাবে দুই এক পালি ধান্য সংগ্রহ করিয়া উহার দ্বারা ছাত্র-বেতন ওয়াশীল করিতে হয়। বাংলার পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্র-পদবাচ্য শ্রেণীর এই অবস্থা।

এই শ্রেণীর যুবক-সম্প্রদায় দেশে থাকিয়া যখন অনাহারে অর্দ্ধাহারে অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে, তখন আসে কলিকাতায়; আসিয়া হয় কোন পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের কাছে, কিংবা কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষদিগের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেয়। কিন্তু এত বেকারের চাকুরী দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কোথায়? আমরা যদি এই সমস্ত লোককে ব্যবসা করিতে উপদেশ দিই, সে কি আমাদের বাতুলতা নয়? যাহাদের দৈনিক হোটেলের খোরাকীর সংস্থান নাই, ব্যবসায় করিবার তাহাদের পুঁজি কোথায়? বাংলার প্রত্যেক পল্লীতে এই শ্রেণীর লোকসংখ্যাই বারো আনা। আমার এসব গল্প নয়, ইহা পল্লীগ্রামের একেবারে নিখুঁত আলেখ্য।

কুটীর-শিল্পি-সম্প্রদায়

কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তাঁতি, তেলি প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। ইহাদের কুটীর-শিল্প প্রায় একেবারেই ধ্বংস হইয়াছে। ইহা আমি 'বাংলায় বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই শ্রেণীর লোকেরা কেহ ভাড়ায় গরুর গাড়ী চালায়, কেহ দুধ বিক্রয় করে, কেহ হাটে-বাজারে রেঙ্গুন বা কলের চাউল

বিক্রয় করে। তেলী-সম্প্রদায়ের ২।৪ জন তাহাদের কাহারও আত্মীয়-স্বজনের তেল-কলে মিস্ত্রিগিরি ও অন্যান্য কাজ করে। ইহাদের চাষ-আবাদ করার মত জমিজমা নাই। ইহারাও মধ্যবিত্ত ভদ্র-সম্প্রদায়ের মত এক রকম বেকার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। যদিও ইহারা নিম্নস্তরের কোন কাজ পাইলে করিতে পারে, কিন্তু কাজ কোথায়? কাজেই ইহাদের অবস্থাও বড়ই শোচনীয়।

কৃষক-সম্প্রদায়

কৃষিজাত ফসলের দর অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু জমির খাজনা একই প্রকার আছে। এই সম্প্রদায় জমিদার-মহাজনের নিকট ঋণজালে জড়িত। অনেকের জমি-জমা ঋণের দায়ে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের পেটে ভাত নাই, পরণে বস্ত্র নাই। বস্ত্রের মধ্যে গামছা লজ্জা-নিবারণের একমাত্র সম্বল। কুঁড়েঘরে ইহাদের বাস, তাহাও আবার অর্থাভাবে মেরামত হয় না। বর্ষার দিনে জল পড়িয়া ঘর ভাসিয়া যায়। ইহাদের শীতের দিনে শীতবস্ত্র নাই, ঐ সময়ে রাত্রিকালে খড়-বিচালী গায়ে ঢাকা দিয়া নিদ্রা যায়। কেহ বা শয্যার পাশে আগুন রাখিয়া শয়ন করে। সমস্ত দিন জন খাটিয়া রোজগার মাত্র তিন আনার পয়সা। তাহাই পরিবার-প্রতিপালনের সম্বল। গৃহে আসবাবপত্র বলিতে মাটির কলসী, হাঁড়ি শান্‌কি, ডিস্‌, ভাঁড়। এই শ্রেণীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বলিয়া কিছুই নাই। রোগ হইলে ফকির-প্রদত্ত জলপড়া, মাটিপড়া ইহাদের ঔষধ। রোগের পথ্য ভিজাভাত, নূণ, লঙ্কা—তাহাতে যে বাঁচে যে মরে। বর্ত্তমান সভ্যজগতে ইহাদের মানুষ না বলিয়া মশা, মাছি, ছারপোকার মত একটা জীব বলিলেই বোধ হয় শোভা পায়। যতপ্রকার অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এদের দেহ অস্থিচর্ম্মসার। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে গরীব নাই,

তাহা নহে। কিন্তু অর্থে গরীব হইলেও স্বাস্থ্যে তাহারা মোটেই গরীব নয়। তাহারা ছাতু, ভুট্টা, বিরি * খাইয়া জীবন ধারণ করিলেও, দেশের জল, বায়ু, প্রকৃতি তাহাদের স্বাস্থ্য গড়িয়া তোলে। বাংলার জল ও বায়ু দূষিত; ম্যালেরিয়া মহামারী তো বাংলার লোকের নিত্য-সহচর। বাংলাদেশ অর্থে দরিদ্র, স্বাস্থ্যে আরও দরিদ্র। **বাংলার প্রকৃতিই আজ অপ্রকৃতিস্থ।**

পল্লী-অঞ্চলে বেকার-সম্প্রদায়ের ব্যবসা

বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যায় সাধারণ লোকের অবস্থা যতই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে, অনন্যোপায় হইয়া লোকে তত ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিতেছে। পল্লী অঞ্চলে যাহারা ২।১ শত টাকা পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা মুদি দোকান, কাপড়ের দোকান কিংবা "সিঙ্গার স্থইং" কোম্পানিতে ২৫৲ টাকা অগ্রিম দিয়া মাস মাস ৫৲ কিস্তিতে একটি সেলাই কল লইয়া জামা সেলাইয়ের (Tailoring) দোকান খুলিয়া বসে। এই সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ীরা নিকটবর্ত্তী মোকাম বা গঞ্জ হইতে পাইকারী দরে মাল খরিদ করিয়া খুচরা বিক্রয় করে। কিন্তু ইহাদের অসুবিধা এই যে, আজকাল ধার বাকী না দিলে বিক্রয় হয় না। আবার ধার দিয়াও গৃহস্থগণের নিকট টাকা আদায় করা কষ্টসাধ্য। এমন কি, লোক-বিশেষে একেবারেই আদায় হয় না। একেতো খরিদ্দারের তুলনায় ব্যবসার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তদুপরি প্রতিযোগিতার ঠেলায় লাভের মাত্রা সামান্য। তাহার উপরও যদি ধার বাকী দিয়া পুঁজি আটকাইয়া যায়, তবে এই সমস্ত সামান্য পুঁজির ব্যবসা আর কি করিয়া চলে? মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সম্প্রদায়ের প্রায় কোন আয় নাই; তাহারা এক-

* একপ্রকার ঘাসের বীচি।

ধার ধার লইলে পরিশোধের উপায় থাকে না। কাজেই গরীব, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ইচ্ছা করিয়া দেনা পরিশোধ করে না তাহা নহে, তাহারা নিরুপায়। আবার গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন প্রতিপত্তিশালী কোন লোককে ধার দিলেও, তাগেদা করিতে করিতে দোকানীর পায়ের তলা ক্ষয় হয়। অবশ্য যাঁহারা সজ্জন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত নামধারী লোকের নিকটও সময়মত টাকা আদায় হয় না। তাগেদায় গিয়া জোর করিয়া দু'কথা বলিবারও উপায় নাই। সম্ভ্রান্ত লোকের অসম্ভ্রম করা হইলে গ্রামের ছোট-বড় সকলেই দোকানীকে নিন্দা করে, এমন কি, দোকান 'বয়কট্' করিতেও কেহ ইতস্ততঃ করে না। তজ্জন্য কথায় বলে,— 'বড়লোকে দিয়ে ধার, আস্‌তে যেতে নমস্কার।' কিন্তু দোকানীর অবস্থার কথা কেহই চিন্তা করে না। দোকানী হয়তো ঐ আদায়ী টাকার দ্বারা তাহার মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া পুনরায় মাল আনিবে, সে কথা কি কেউ চিন্তা করে?

এই প্রসঙ্গে আমি গ্রামাঞ্চলের জনৈক ব্যবসায়ীর কথা এইখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। জনৈক নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ গ্রামের মধ্যে ব্যবসায় করিয়া বেশ অবস্থাপন্ন হয়। কিন্তু দশজনের সঙ্গে সমাজে এক পংক্তিতে বসিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়ার তাহার 'সার্টিফিকেট্' ছিল না। গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন কুলীন কায়স্থ তাহার দোকানের খরিদ্দার এবং তাঁহারা সকলেই উক্ত ব্যবসায়ীর নিকট দেন্‌দার। সমাজের কয়েকজন নেতা তখন যুক্তি-পরামর্শ করিয়া, বহু টাকা ব্যয়ে একটি ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। পংক্তিতে আসন পাইয়া ব্যবসায়ী ভাবিলেন, তিনি স্বর্গে উঠিতেছেন। এই আনন্দে আত্মহারা হইয়া টাকার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বহু অর্থব্যয়ে তিনি সমাজে সনদ্ প্রাপ্ত হইলেন। কয়েক দিন পরে ব্যবসায়ীর ব্যবসাতে

যখন টাকার টান্ পড়িল, তখন পাওনাদারের নিকট তাগেদায় গেলে প্রথমতঃ ওয়াদা চলিতে লাগিল, পরে বচসায় পরিণত হইল, তখন গ্রামের মধ্যে সুর উঠিল,—"লোকটি বড়ই অসজ্জন, মানীর মান রাখিতে জানে না, এরূপ লোককে সমাজে স্থান দেওয়া উচিত নহে। উহাকে একঘরে করিতে হইবে।" একদিকে ব্যবসায়ী স্বর্গে উঠিলেন, অন্যদিকে ব্যবসা শিকায় উঠিল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি কলিকাতার জনৈক আড়াই হাজার টাকা বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীর কথা উল্লেখ করিব। আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে উক্ত বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমার উপস্থিতিতে পর পর কয়েকজন পাওনাদারকে উপস্থিত হইতে দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে কাহাকে বলা হইল, "পরের মাসে আসিও", কাহাকে বলা হইল, "ব্যাঙ্কের চেক-বই ফুরাইয়াছে, পরে লইবেন।" একজনকে বলা হইল —"বাড়ীতে আজ একটা ঝঞ্ঝাট আছে, অন্যদিন আসিবেন।" এইভাবে যাতায়াতে দু' দু'বার নমস্কার ঠুকিয়া সকলেই ফিরিয়া গেলেন। অবশেষে জনৈক শালজামা-ধোলাইওয়ালা হাজির হইলে তাহাকে বলা হইল, "আজ যাও, মাসকাবারে আসিও।" ইহাতে অশিক্ষিত পাওনাদার হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "বাবু! আপনার মত লোকের কাছে যদি দশবার তাগেদায় আসি, তবে আমাদের উপায় কি?" বাবু বিশেষ অপমান বোধ করিয়া রাগতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পাওনা কত?" সে বলিল, "১৩২৲ টাকা।" বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, কাল তোমার টাকা লইয়া যাইও, কিন্তু ভবিষ্যতে আর আমার বাড়ীর কাজ পাইবে না।"

এই অবস্থাপন্ন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের দেনা-পাওনা পরিশোধের বেলায় যদি এই জাতীয় মনোবৃত্তি হয়, তাহা হইলে সাধারণ গৃহস্থের কথা না বলাই ভাল। বরং দেখিয়াছি যাহাদের অবস্থা শোচনীয় তাহারা

দেনার ভয় করে, কিন্তু বড়লোকেরা উহা গ্রাহ্য করে না।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত দেনা পরিশোধের সময় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—অমুক দিন অমুক জিনিসটা বড় খারাপ হইয়াছে, অমুক জিনিস ওজনে কম হইয়াছে, অমুক জিনিসের দাম খুব বেশী ধরিয়াছেন ইত্যাদি। এইরূপ নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি জানাইয়া পাওনাদারের প্রাপ্য টাকা হইতে কিছু কিছু কাটিয়া লইয়া থাকেন।

ব্যবসায়ে বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে পল্লীর ঐ সমস্ত বেকার ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা ধার বাকীর ঠেলায় অস্থির হইয়া প্রায়ই কারবার নষ্ট করিয়া ফেলে।

সুতরাং এখানেও জনসাধারণের সহানুভূতি চাই। পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় অগ্রসর না হইলে সমাজই টিকিতে পারে না, ব্যবসাতো সামান্য কথা। এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে। কবি কামিনী রায়ের কবিতায় এই ভাবটিই বড় মধুর পরিস্ফুট হইয়াছে—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

বাংলার কুটীর-শিল্প ধ্বংস
ও
তাহার কারণ

বাংলার বহু কুটীর-শিল্পই লোপ পাইয়াছে। এই কুটীর-শিল্প কেন এবং কিরূপে ধ্বংস হইল, সে কথা লিখিতে হইলে এক মস্ত ইতিহাস হয়। যোগ্যতর ব্যক্তি সে ভার গ্রহণ করিবেন। মনস্বী যদুনাথ সরকারের মত কোন পণ্ডিত ব্যক্তি যদি এ ভার গ্রহণ করেন, অনেক অজ্ঞাত সত্যের উপর আলোক-সম্পাত হইবে। আমি মোটামুটি কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিয়া যাইব মাত্র।

মেদিনীপুরের কাঠির মাদুর

মেদিনীপুর জেলার কাঠির মাদুর এক সময়ে একটি অতি-প্রচলিত কুটীর-শিল্প ছিল। ইহা দ্বারা পল্লীর বহু গৃহস্থের অন্ন-সংস্থান হইত। প্রতি সপ্তাহে মেদিনীপুর হইতে ১৫।২০ হাজার টাকার মাদুর ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি, জাভা সিংহলে পর্য্যন্ত রপ্তানি হইত। সস্তায় জাপানী মাদুর আমদানির ফলে এই কুটীর-শিল্পটি একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত-গবর্ণমেণ্ট জাপানী মাদুরের উপর যদিও কিছু শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং সেই ভরসায় গৃহস্থেরা পুনরায় কাঠির চাষ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইলেও প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার মতন অবস্থা এখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ভারত-গভর্ণমেণ্ট যদি জাপানী মাদুরের উপর আরও কিছু শুল্ক বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে উক্ত কুটীর-শিল্প পুনরুজ্জীবিত

হইতে পারে, এবং তাহাতে মেদিনীপুরের ৫০।৬০ হাজার লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হয়।

সস্তায় জাপানী শিল্প আমদানী

বাজারে সস্তায় জাপানী শিল্প আমদানির ফলে ভারতের বহু কুটীর-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। জাপানের "কন্‌সাল্ জেনারেল" ভারতের বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া ভারতবাসীর নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রত্যেক জিনিষটি খরিদ করিয়া জাপানী ব্যবসায়ীদের নিকট প্রেরণ করেন, জাপানী ব্যবসায়ীরা তখন ঐ সমস্ত জিনিষের অনুকরণে সস্তা মাল তৈয়ারী করিয়া ভারতে পাঠায়। ভারতের বহুবিধ শিল্প-ধ্বংসের জন্য একমাত্র জাপানীদেরই দায়ী করিতে হয়। ভারতীয় শিল্প বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে **বিদেশী জিনিষের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক বসান প্রয়োজন।**

পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্রই নূতন নূতন শিল্প-আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিকদিগের পিছনে রাজস্ব তহবিল হইতে বৎসরের পর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। পরীক্ষামূলক গবেষণা সব সময়েই ফলবতী হয় না, সুতরাং কোন কোন স্থলে এই অর্থ-ব্যয় নিষ্ফলও হইয়া যায়; কিন্তু তজ্জন্য কাহাকে কোন কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত দিতে হয় না। আর আমাদের দেশে সমুদয় রাজস্বের অর্দ্ধেক টাকা সামরিক ব্যয় ও ভারত সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণের সুদে চলিয়া যায়। বাকী টাকা পুলিস, গোয়েন্দা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের মোটা মাহিনায় ব্যয় করিয়া, দেশের গঠনমূলক কার্য্যের জন্য অতি সামান্য অংশ রাখিয়া প্রায়ই 'ঘাটতি বাজেট' (Deficit Budget) দাখিল হয়। কাজেই থিয়েটার, বায়স্কোপ এবং তামাকের উপর কর ধার্য্য করিয়া শাসন-ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। দেশের সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে, জলাভাবে মরিতে

থাকিলেও সরকারী সাহায্য প্রার্থনায় কোন ফল দেখা যায় না। এই-ই যেখানে অবস্থা, সরকারী সাহায্যে সেখানে বৈজ্ঞানিকদিগের শিল্প-গবেষণার কথা চিন্তা করা স্বপ্ন মাত্র।

ইংলণ্ডের বণিক-সম্প্রদায় ভারতে শিল্প-প্রস্তুতের বিরোধী। ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হইলে উক্ত বণিক-সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতি—একথা ইহারা কখনও ভুলেন না। কাজেই ভারতবাসীরা শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করুক, ইহা কোন বিদেশী বণিক-সম্প্রদায় সমর্থন করিতে পারে না। তা'ও একমাত্র ইংলণ্ডের বণিক-সম্প্রদায় ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইলেও বড় বেশী দুঃখ ছিল না। জাপান, জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের বণিক-সম্প্রদায় ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া ইহাকে শোষণ করিতে থাকিলে, ইহার অস্তিত্ব বজায় থাকা কখনই সম্ভব নহে। বিদেশী মালের উপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপনই শোষণ-নীতি বন্ধের একমাত্র উপায়। কিন্তু সে পন্থা অবলম্বন করিতে গেলে হয়তো শক্তিশালী পররাষ্ট্রগুলিকে সন্তুষ্ট রাখার খাতিরে ইংলণ্ডের আমদানি মালের উপরও শুল্ক বৃদ্ধি করিতে হয়। রাজশক্তির সাহায্য ভিন্ন কখনই কোন দেশের শিল্পোন্নতি হয় না। জাপান যে এত দ্রুত শিল্পোন্নতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ রাজশক্তির সাহায্য। জাপান আয়তনে বাংলা প্রদেশের মত একটী স্থান হইলেও তথায় ১৩৪৬টী শিল্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে। ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেদিকে আগ্রহ থাকিলে, এতদিন ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের যেমন প্রসার হইত, তেমনি দেশে বেকারের সংখ্যাও এত বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত না।

আমাদের বাংলা দেশে যে-সকল সহৃদয় দানশীল ব্যক্তি স্কুল, কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যকল্পে প্রচুর অর্থ দান করিয়া

থাকেন, তাঁহারা যদি দেশে শিল্প আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থ দান করেন, তাহা হইলে আমাদের বাংলায় যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁহারা গবেষণা করিয়া অনেক নূতন শিল্প আবিষ্কারের পথ প্রদর্শন করিয়া দিতে পারেন। বাংলায় যে সমস্ত মনীষীরা বেকার-সমস্যা সমাধানে মনোযোগী, তাঁহারা লিমিটেড্ কোম্পানী-গঠনে ঐ সমস্ত শিল্প প্রস্তুত করিয়া প্রতিযোগিতায় বিদেশী শিল্পকে দেশ হইতে হটাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে ক্রমে ক্রমে বাংলায় বেকার-সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে। দেশের স্কুল-কলেজে অর্থদান করিলে, কেরাণী গড়া-শিক্ষার সাহায্য করা হয় মাত্র। কিন্তু তাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহের কোন উপায় হয় না। দেশের বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে হইলে, বহু-সংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে, তবে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত শিল্প যাহাতে বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। নচেৎ জন-সাধারণের অর্থের অপব্যবহার হইবে মাত্র। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্যবসা-বুদ্ধি-সম্পন্ন, কর্ম্মঠ ও বিশ্বাসী লোক হওয়া দরকার।

দাতব্য-চিকিৎসালয়ে দান

আমার উল্লিখিত যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে হয়তো এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য যদি কেহ অর্থ দান করেন, তাহা অনর্থক নহে। গরীব দেশের পক্ষে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন যে যথেষ্ট প্রয়োজন, ইহা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু মফঃস্বলে ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের অধীনে পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে জন-সাধারণের যে বিশেষ উপকার সাধিত হয়, তাহা মনে করা ভুল।

যদি বা ইহার কোন সার্থকতা থাকে, তথাপি দেশের বেকার-সমস্যা সমাধান করিয়া, আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। দেশে অর্থ-স্বচ্ছলতা থাকিলে, জনহিতকর কোন কাজই আটকাইয়া থাকে না।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের দানে, 'যাদবপুর ট্রেণিং স্কুল' স্থাপিত হইয়াছে, এবং কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক রিসার্চ্চ সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে শুনিয়াছি, কিন্তু অর্থাভাবে উহাতে কোন কাজ হইতেছে না। বাংলার দানশীল ব্যক্তিরা যদি কোন নির্দ্দিষ্ট শিল্প আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অর্থ দান করেন, তাহা হইলে বাংলায় শিল্প-আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হইতে পারে।

মোটর-যানে দেশ-শোষণ

মোটর-গাড়ী আজকাল সভ্যতার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "মোটর নাই, বড় লোক"—একথা আজিকার দিনে অর্থহীন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"Hamlet without Hamlet"—মোটর-ছাড়া বড়-লোকও লোকের চোখে আজ তাই। অভিজাত-পরিবারের আলোক-প্রাপ্তা কুমারীরা বাগ্‌দত্তা হওয়ার প্রাক্কালে নাকি এই খবরটাই ভাল করিয়া জানিয়া লন—ভাবী স্বামীর গাড়ীখানি কোন্ কোম্পানীর এবং কত হাজার টাকা মূল্যের। যদি শুনেন, 'রোল্‌স রয়েস্' (Rolls Royce), তবে আর কোন প্রশ্নই উঠে না—হৃদয়ের ভাষা লজ্জারুণ চাপাহাসিতে চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে। মোট কথা মোটর-গাড়ীর দরে স্বামীর দর যাচাই হয়। হইবারই কথা। এইবার ব্যবসায়ীর সাদা-চোখে ইহার ভাল মন্দ দিক্‌টা যাচাই করা যাক্।

শোষণের পরিমাণ

ভারতবাসীর বিলাসিতা চরিতার্থের জন্য, যে দিন হইতে ভারতে মোটর-গাড়ীর আমদানী সুরু হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের অর্থ বন্যার স্রোতের মত বিদেশে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার একটি টাকাও আর ভারতে ফিরিয়া আসে না। একমাত্র কলিকাতা সহরে প্রায় ৫০ হাজার প্রাইভেট্ মোটর-গাড়ীর নম্বর দেখা যায়। গড়ে এক একখানি গাড়ীর মূল্য মেরামতী ব্যয় সমেত যদি কমপক্ষে চারিহাজার টাকা ধরা যায়, তবে ৫০ হাজার প্রাইভেট্ গাড়ীতে শুধু কলিকাতা হইতেই ২০ কোটী টাকা কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা বিদেশে মণি-অর্ডার করিয়াছি। ইহা ছাড়া

পেট্রোল, মবিলের দরুণ যে প্রতিদিন কত টাকা বিদেশে যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উক্ত প্রাইভেট্ গাড়ী ব্যতীত ট্যাক্সি, লরী, ও বাস-এর সংখ্যা এবং তাহাদের আনুমানিক ব্যয় নির্ণয় করিয়া যদি দেখা যায়, তবে দেখা যাইবে ভারত-গবর্ণমেণ্ট দুইশত বৎসর সাম্রাজ্য-পরিচালনে যে টাকা ঋণ করিয়াছেন, আমরা বিশ বৎসরে মোটর গাড়ীর বিলাসিতায় সে তুলনায় তাহার বেশী টাকা বিদেশে প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু বিনিময়ে এক কপর্দ্দকও পাই নাই।

উক্ত গাড়ী ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িলে, মল্লিকবাজারে ভাঙ্গাই ওয়ালাদিগের নিকট হয়তো উহার বিনিময়ে ২৫।৩০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ভারতে যদি মোটর-সরঞ্জাম (parts) তৈয়ারীর একটি কারখানাও থাকিত, তাহা হইলে হয়তো গাড়ীগুলি মেরামতের সময় সরঞ্জামের কিছু মূল্য এবং মিস্ত্রিদের মজুরী বাবদে কিছু কিছু দেশে থাকিত। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, মোটর-গাড়ীর প্রচলনে জন-সাধারণের যাতায়াতের সুবিধা ও সময় সঙ্ক্ষেপ হইয়াছে, ইহা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু এই যানবাহন প্রচলনে দেশবাসীর কোন প্রকার স্বার্থের সংস্রব নাই, এবং ইহাতে দেশের টাকা একতরফা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এই মোটর-গাড়ী যদি আমাদের নিজের দেশে প্রস্তুত হইত, বিলাসিতায় ক্ষতি ছিল না, দেশের টাকাটা দেশেই থাকিত। কিন্তু ভারতের যে অর্থের বিনিময়ে দেশের লোক কাণা-কড়িও পায় না, তাহাতে দেশ নিঃস্ব না হইয়া কি ধনী হইয়া উঠিতে পারে?

মোটর লরি

মোটর লরীতে মাল চালান দেওয়ার প্রচলন হওয়ায়, দেশের বহু গাড়োয়ানের অন্ন মারা গিয়াছে। দশখানি গরুর গাড়ীতে মাল চালান

হইয়া, যেখানে দশজন গাড়োয়ানের অন্নের সংস্থান হইত, সেখানে এক্ষণে মাত্র একজন ড্রাইভার মাসে ২৫।৩০৲ টাকা মাহিনা পায়; গাড়োয়ান দশজনেরই অন্ন মারা গিয়াছে। ড্রাইভারের উক্ত ২৫।৩০৲ টাকার মধ্যেও পুলিশকে কিছু ভাগ দিতে হয়, এবং সময় সময় ফৌজদারী আদালতে জরিমানাও দিতে হয়।

যাঁহারা ভাড়া খাটানোর জন্য মোটর লরীর ব্যবসা করেন, তাঁহাদের খরচ পোষাইয়া কিছু লাভ হওয়াতো দূরের কথা, এমন কি গাড়ীর খরিদ-মূল্যও ফেরত পান না। এ ব্যবসায় বলিতে গেলে, পাঞ্জাবীদের একচেটিয়া। ইহার কারণ আছে। তাহারা নিজেরাই ড্রাইভার, নিজেরাই মিস্ত্রী। সুতরাং দু'পয়সা তাহাদের থাকে। পাঞ্জাবীদের মত নিজে ড্রাইভার, নিজে মিস্ত্রী হইতে না পারিলে কাহারও এ ব্যবসায়ে নামা উচিত নহে।

বাংলার কৃষি-উন্নতি

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদ করিয়া বাংলার জমীতে যাহাতে ভালভাবে ফসল উৎপন্ন হয় এবং চাষীদের অবস্থা উন্নত হয়, সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। চাষীর অবস্থা উন্নত হইলে সাধারণ লোকের অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। বাংলাদেশে চাষীর অবস্থা শোচনীয় হওয়ার ফলেই, আজ সাধারণের মধ্যে এই ভীষণ অর্থকষ্ট দেখা দিয়াছে। শিল্পোন্নতি হইলেও যদি চাষীর অবস্থা ভাল না হয়, বাংলাদেশের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবে না। শুধু শিল্প-আবিষ্কারের দ্বারা দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতার কোন সম্ভাবনা নাই।

সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, গবর্ণমেণ্ট বাংলার কৃষি-উন্নতির গবেষণায় অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু উহার ফলাফল জন-সাধারণের অজ্ঞাত। সরকারী সাহায্যে বাংলায় কৃষি-উন্নতির কোন চেষ্টা দেখা যায় না, অথচ বাংলার কৃষক-সম্প্রদায়ের এই দারুণ অর্থ-সঙ্কটের দিনে একপ্রকার তাহাদেরই রক্তশোষণ করিয়া রাজস্ব আদায় হইতেছে। অথচ এই রাজস্বের অধিকাংশ টাকা ব্যয় হয় শাসন-কার্য্যে ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর পিছনে। ছিটেফোঁটা যাহা থাকে তাহাই দেশের গঠনমূলক কার্য্যে ভিক্ষার চা'লের মত ছিটাইয়া দেওয়া হয়। দেশের জনহিতকর কার্য্যের জন্য কোন প্রকার সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিলে বলা হয়, "নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা ছাড়া উপায় নাই।" সরকারী তহবিলেও কোনদিন স্বচ্ছলতা আসিবে না, দেশের গঠনমূলক কাজেও কিছু ব্যয় হইবে না।

ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের কর্ত্তব্য

বাংলার ডিষ্ট্রীক্ট্‌বোর্ডগুলি ইচ্ছা করিলে কৃষি-উন্নতির কিছু সাহায্য করিতে পারেন। কৃষক-সম্প্রদায়-প্রদত্ত সেসের দ্বারাই ডিষ্ট্রীক্ট্‌বোর্ড পরিচালিত হয়, সুতরাং তাহাদের হিতার্থে উক্ত বোর্ডের কিছু চেষ্টা না করা অনুচিত। জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে ডিষ্ট্রীক্ট্‌বোর্ডের অধীনে যেমন স্যানিটারী ইনস্‌পেক্টার নিযুক্ত আছেন, কৃষির উন্নতিকল্পেও তেমনি ইনস্‌পেক্টার থাকা উচিত। প্রত্যেক জেলায় উন্নত ধরণে চাষ-আবাদ শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি কৃষিবিদ্যা-পারদর্শী ইনস্‌পেক্টার নিযুক্ত হইয়া যদি প্রত্যেক ইউনিয়নের চাষীদিগকে যুক্তি পরামর্শ দেন, তাহা হইলে অনেক সুফলের আশা করা যায়। কোন্ জমীতে কি উপায়ে চাষ-আবাদ করিলে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়, ইহা আমাদের চাষীরা আদৌ অবগত নহে। বৰ্দ্ধমান্ ও বাঁকুড়া জেলায় কেবলমাত্র গোবরের সার দিয়া জমীতে যে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, বাংলার অন্যান্য জেলার চাষীরা তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত রাখে না। ঐ সমস্ত কৃষি-ইনস্‌পেক্টারগণ যদি বাংলার প্রত্যেক ইউনিয়নে চাষী-মহলের কতকগুলি জমী লইয়া চাষ-আবাদ করাইয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন, তবে ক্রমশঃ তত্রত্য সমস্ত চাষীই উক্ত প্রণালী অনুসরণ করিবে।

কৃষি-গবেষণা

কোন্ কৃষকের কত পরিমাণ জমীতে কি প্রকার ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পূর্ব্বে তাহাতে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইত, তাহা ইনস্‌পেক্টারগণ স্থানীয় ভদ্রলোক ও কৃষক-সম্প্রদায়কে সাক্ষী রাখিয়া বোর্ডের নিকট রিপোর্ট দিবেন। উক্ত ইনস্‌পেক্টারগণ কর্ত্তৃক

সত্য সত্য কোন কাজ হইতেছে কিনা কিম্বা শুধু চাকুরী বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা কতকগুলি মিথ্যা রিপোর্ট দিতেছেন, ইহা পরীক্ষার জন্য সেই অঞ্চলের বোর্ডের সদস্যকে মাঝে মাঝে প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান লইতে হইবে। নতুবা গবর্ণমেণ্টের পাবলিক ইন্‌ডাষ্ট্রীজ বিভাগ কর্ত্তৃক বাংলায় যে প্রকার শিল্পোন্নতি হইয়াছে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে।

ইন্‌স্‌পেক্টারগণকে ঐ সমস্ত চাষ-আবাদের হাতে-কলমে (practical) পরীক্ষা প্রদর্শন করিতে হইলে প্রথমাবস্থায় ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডকে জমীর সার খরিদের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। কারণ পরীক্ষার সফলতা না দেখিয়া চাষীরা নিজেদের কোন অর্থ উহাতে ব্যয় করিবে না। কৃষক-সম্প্রদায় যদি একবার ইহার সুফল বুঝিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই প্রণালী অনুসরণ করিবে।

ইউরোপের সকল দেশেই কৃষি-উন্নতির জন্য গবেষণাগার আছে। তত্রত্য চাষীরা তাহাদের জমীর মাটি উক্ত গবেষণাগারে লইয়া গেলে সেখানে উহা পরীক্ষা করিয়া, যে উপায়ে উক্ত জমীতে চাষ করিলে ভাল ফসল উৎপন্ন হইবে, তাহা বলিয়া দেওয়া হয়।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড স্যানিটারী ইনেস্‌পেক্টরগণের জন্য যে টাকা ব্যয় করেন, যদি উহা হ্রাস করিয়া কৃষি-উন্নতিকল্পে কয়েক বৎসর কিছু টাকা ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে বাংলার কৃষি-উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। দেশে ভেজাল ও অখাদ্য-বিক্রয় নিবারণকল্পে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে পল্লী-অঞ্চলের লোক যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে, তাহাতে তৈল, ঘৃত প্রভৃতি স্যানিটারী আইনের কোন জিনিস তাহারা ব্যবহার করিতেই পায় না। উক্ত আইনের কবলে পড়ে না এমন সব জিনিষ—যেমন

শাক, পাতা, কচুসিদ্ধ, প্রভৃতি অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়াই কোনমতে তাহাদের দিন চলে। দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ সাধারণ লোকের এরূপ শোচনীয় অবস্থায় দিন যাপন করিতে হয় না। যে-দেশে এক বৎসর ধানের অজন্মা হইলে রেঙ্গুন হইতে একমাত্র কলিকাতা বন্দরেই ৯৩ লক্ষ বস্তা চাউল আমদানির প্রয়োজন হয়, সে দেশে স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টারের অপেক্ষা কৃষি-ইন্‌স্‌পেক্টারের যে বেশী প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। একমাত্র কৃষির আয়ের (Agricultural income) উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের খাজনা ট্যাক্স দিতে হয়, তাহাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা না করিলে শাসক-সম্প্রদায়ের এত মোটা মাহিনাই বা যোগাইবে কে? ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দুঃস্থ লোকদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপনে অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সাগু-বার্লি পথ্যও যাহাদের জোটে না, তাহারা কি শুধু উক্ত ডাক্তারখানার এক শিশি "পট্ মিক্সার" (Pot mixture)) খাইয়াই ব্যাধিহীন হইয়া যাইবে! যাহার দেহের ভিতরে ব্রণ, বাহ্য প্রলেপে তাহার আর কতটুকু উপকার হইবে? খাদ্যই যাহাদের জুটে না, খাদ্য পরীক্ষার জন্য তাহাদের আবার ইন্‌স্পেক্টার! 'গৃহই নেই, তার আবার গৃহিণী!' সাগু, বার্লি পথ্যটাও যাহাদের জোটে না, তাহাদের জন্য আবার ঔষধ-ব্যবস্থা! প্রহসন আর কা'কে বলে? আমাদের শাসন-তন্ত্রের ভড়ংই আছে, আসলে ভিতর ফাঁকা।

যে দেশের সমুদয় রাজস্বেও শাসক-সম্প্রদায়ের উদর পূর্ণ হয় না, তামাকের উপরও কর ধার্য্য করিতে হয়, সেই অভিশপ্ত দেশের ততোধিক অভিশপ্ত প্রজাবৃন্দের অভাব-অভিযোগ আবেদন-নিবেদনের ঝুলি লইয়া মন্ত্রীদের দ্বারস্থ হওয়ার কি সার্থকতা আছে? তাহার

চেয়ে 'সুখী-পরিবারের' আরাম-শয়নে ব্যাঘাত না জন্মানোই বুদ্ধি-মানের কাজ।

ওরা আর আমরা

মার্কিন ধনকুবের মিঃ হেনরী ফোর্ড তাঁহার ৭৪ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বলিয়াছেন, "আজ জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে আমার বয়সের কথা যদি স্মরণ করাইয়া না দেওয়া হইত, তবে আমার যে এত বয়স তাহা আমার মনেই হইত না। পৃথিবীতে মানুষের কখনও কাজের অভাব হয় না, মানুষ বেকার থাকিতে পারে না। কাজ অফুরন্ত, কিন্তু কেহ তাহার দিকে দৃক্‌পাত করে না বলিয়াই বলে "কাজ নাই" "কাজ নাই"। সকলেই চাকুরী চায়, কাজ কেহ চায় না। দেশে নেতৃস্থানীয় উপযুক্ত লোক থাকিলে শিল্প-ব্যবসায়ে অনেক উন্নতি হইত, এবং সাধারণ লোকের কাজের অভাব হইত না।"

আমেরিকার মত স্বাধীন এবং শিল্প-প্রধান ধনীর দেশে বসিয়া জগতের একজন বিখ্যাত ধনকুবেরের মুখে উল্লিখিত উক্তি শোভা পায় বটে! কর্ম্মবহুল ধনী দেশের লোকমাত্রেই সংসারে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়—জীবন উপভোগের জন্য, কিন্তু আমাদের মত অভিশপ্ত, পরাধীন, অর্থহীন, কর্ম্মশূন্য দেশের লোক,—অভাবের তাড়নায় যাহারা অবর্ণনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে চায় না। সর্ব্বদুঃখহরা মৃত্যুই তাহাদের কাম্য। স্বাধীন ও পরাধীন দেশের লোকের জীবনের মধ্যে এই প্রভেদ।

বর্ত্তমান শিক্ষায় বাঙালী কোন্ পথে

[আমার এই পুস্তকে এটি উপসংহার-প্রবন্ধ। ইহার পরে আমি 'বিবিধ-ব্যবসায়' নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছি। সেটি ঠিক প্রবন্ধ নয়, বিবিধ ব্যবসা সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য-বিষয়ের সমষ্টি মাত্র। তাহা পরিশিষ্ট অধ্যায়।]

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আলোচনা করিয়াছি। হয়তো আমার সঙ্গে সকলে একমত হইবেন না, কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, আমার মন্তব্য কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক হইয়াছে। বলিবেন, একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া আমি জিনিসটিকে বিচার করিয়াছি। কাজেই ইহার মন্দটাই আমি দেখিয়াছি, ভালটা দেখি নাই। কিন্তু তাহা মোটেই নয়।

শিক্ষার চেয়ে বড় আর কিছু নাই। শিক্ষা কেবল সভ্যতার অঙ্গ নহে, শিক্ষা সভ্যতার স্রষ্টা,—রূপদাতা। শিক্ষা ছাড়া সভ্যতার কল্পনাই করা যায় না। জগতের সকল জাতিই শিক্ষার ভিতর দিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ কলকারখানার যুগ (age of machinery); ইহাও শিক্ষারই দান। শিক্ষা ভিন্ন রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, বিজ্ঞান-চর্চ্চা, কোন কিছুরই উন্নতি সম্ভব নহে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদিগকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছে, তাহাও তো ভাবিবার বিষয়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে বাংলা আজ একেবারে নিঃস্ব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-প্রথা থাকায় বাংলার লোকের এক সময়ে সাধারণ ভরণ পোষণের কোন ভাবনা ছিল না, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যাকুলতাও ছিল তাহাদের কম। যে দেশে অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, সে দেশের

লোক স্বভাবতঃই অলস হইয়া পড়ে। এমন কি, সুজলা সুফলা বাংলাদেশে চাষীদেরও বৎসরে তিনমাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া বাকী নয় মাস আলস্যে অতিবাহিত করিতে হইত। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা ছিল অন্যরূপ। এত সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা তাহাদের ছিল না। কাজেই ভারতের ঐ সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীরা ব্যবসার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তাহারই ফলে আজ তাহারা ধনী ব্যবসায়ী। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' যে বাংলার দুর্গতির প্রথম ও প্রধান কারণ, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও বাংলার এত সর্ব্বনাশ হইত না, যদি সাধারণ লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরাণী-গড়া শিক্ষার দিকে এমনি ঝুঁকিয়া না পড়িত।

শিক্ষার স্বরূপ

আজ মাড়োয়ারী, ভাঁটিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় বাংলাদেশে ব্যবসায় করিয়া প্রভূত ধনী। তাহাদের মধ্যে তথা-কথিত শিক্ষিতের সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। আর তথা-কথিত শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী আজ অন্ন-সমস্যায় বিব্রত। চাকুরী নাই, অতএব তাহাদের করিবারও আর কিছু নাই! আমাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু—যাহারা ব্যবসায় করিত এবং যাহাদের বংশধরগণ এখনো ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, তাহারা উচ্চবর্ণের সম্পত্তিশালী লোকদিগকে টাকা ধার দিয়া, তাঁহাদের সম্পত্তির এখন মালিক হইয়া বসিতেছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দু জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি এবং যাঁহারা এতদিন বড় বড় চাকুরী করিয়া কিছু সম্পত্তি ও অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা প্রায় সকলেই ঋণগ্রস্ত। সভ্যতার চাল-চলন বজায় রাখিতে গিয়া সকলেই নিঃস্ব। কেরাণীর ত কথাই নাই! যেমনি আয় তেমনি ব্যয়—বরং মুদি-দোকানে দেনদার। কাহারও কিছুই সঞ্চয় নাই।

'হয়তো কন্যার বিবাহে কিংবা কঠিন পীড়ায় ভিটামাটি অলঙ্কারাদি যাহা কিছু সমস্তই বন্ধক পড়িয়াছে কিম্বা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

যে শিক্ষা অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, অধিকন্তু বিলাসিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়, আমাদের বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা তা'ই। একটি ছেলেকে বি, এ, এম, এ, পড়াইতে যে অর্থ খরচ হয়, হয়ত অনেক ছেলে জীবনে তাহা রোজগার করিতে পারে না। যাঁহারা কায়ক্লেশে, এমন কি, ঋণ করিয়াও পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দেন, তাঁহারা হয়তো পুত্রের বিবাহের সময় কন্যার পিতার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ওয়াশীল করেন। নতুবা বর্ত্তমান দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই Servantship পরীক্ষায় পাশ করিয়া অন্নসমস্যার সমাধান নাই।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বি-এ পাশ করিতে চারি বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। তাহাতে অভিভাবকদের যে অর্থ আর ছেলেদের যে সময় নষ্ট হয়, যদি সেই সময় ও অর্থ কোন অর্থকরী শিক্ষায় নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে যুবক-সম্প্রদায় হয়ত কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে না, কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়।

উচ্চশিক্ষা কাহাদের জন্য

অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রদিগকেই কেবল উচ্চ-শিক্ষা দেওয়া উচিত। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষা হইতে দূরে থাকাই ভাল।

অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা যাহাদিগকে বিব্রত করে না, আমি বলি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় তাহারাই শিক্ষিত হউক। উচ্চশিক্ষা ধনীদেরই জন্য; কারণ উচ্চ-শিক্ষা স্বভাবতঃ বিলাস ও আড়ম্বরের প্রতি একটা আগ্রহ জন্মাইয়া দেয়। চোখের উপরেই দেখিতে পাই, পাঁড়াগা হইতে কলেজে পড়িতে আসিয়া সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদেরও পোষাক-

পরিচ্ছদ ও বায়স্কোপের নেশায় পাইয়া বসে। ধনীর দুলালদের সহিত একত্রে হোষ্টেলে বাস করিতে আসিয়া ঐ সকল গরীবের ছেলে-দেরও তাঁহাদের চাল-চলনের সহিত সমান তালে চলিতে সাধ যায়, এবং তাহাতে অনেকেই নিজেদের আর্থিক অবস্থার কথা ভুলিয়া যায়। ছাত্রদের জীবন ও চরিত্র যখন গঠনের মুখে, ঠিক তখনই যদি তাহাদের মনে ধনি-সন্তানের জীবন-যাত্রার আদর্শ বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে তাহাদের মিতব্যয়িতার শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায়। আর প্রথম জীবনেই যদি বালকগণ মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা না পায়—বিলাস আড়ম্বর-পূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, উত্তরকালে সংসার-জীবনে প্রবেশ করিয়া আর তাহারা আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না, ঋণগ্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করে। রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী করে।" স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে সামান্য শ্রমিক হইতে যিনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন, ইহা সেই ব্যক্তির কথা, কোন ভাববিলাসী ব্যক্তির কথা নহে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আমি একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা না করিয়া পারিলাম না। আমি জনৈক নিরক্ষর ব্যবসায়ীর কথা জানি। তিনি প্রথম জীবনে কোন একটি ইংরাজ কোম্পানীর লোহার কার-খানায় মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে মিস্ত্রির কাজ করিতেন। পরে নিজের অধ্যবসায়ে নিজেই অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রথমে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ প্রভূত টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে মাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াইয়া নিজের কারখানায় মিস্ত্রিদের সহিত কাজ শিক্ষায় নিযুক্ত করিতেন। কিছুকাল ঐ ভাবে কাজ শিক্ষা দেওয়ার পর তাহাদের উপর মিস্ত্রিদের কার্য্য-তত্ত্বাবধানের ভার দিতেন। তাঁহার পুত্রেরা পিতার নিকট ঐভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমানে ঐ

কারখানার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রেরা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তিনি একজন বিশিষ্ট ধনী। যদি তিনি তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় পুত্রদিগকে ঐরূপ সাধারণ মিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত করা অপছন্দ করিতেন, এবং পুত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে হয়তো এতদিনে তাঁহার ব্যবসার অস্তিত্ব লোপ পাইত।

বর্ত্তমান শিক্ষার কুফল

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন নিরক্ষর ব্যক্তি অতিশয় হীনাবস্থা হইতে প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াও নিজের নিরক্ষরতার জন্য সভ্য-সমাজে মেলামিশা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা প্রাণের মধ্যে একটি গোপন বেদনাও অনুভব করেন। সভ্য-সমাজে মর্য্যাদার আসন লাভ করিবার আশায় ইঁহারা পুত্রদের সু-শিক্ষিত করিতে অর্থব্যয়ে কোনপ্রকার কৃপণতা করেন না। কিন্তু পিতাদের সাধ কতটা পূর্ণ হয়, তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ পুত্রকে বি, এ, এম্, এ পাশ করাইয়া এদিকে তাঁহারা আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন বটে, পুত্রগণ কিন্তু নিরক্ষর "অসভ্য" পিতাকে উচ্চ-শিক্ষার মহিমায় পিতৃ-সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত বোধ করেন। এমনও শোনা যায়, পিতাকে পিতা পরিচয় দিতেও কেহ কেহ সঙ্কুচিত হন। পিতাদের কৃতী পুত্রদের নিকট "old fool" আখ্যা লাভ করিতে হয়। কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁহার "বৈকুণ্ঠের উইল"-এ নিপুণ তুলিকাপাতে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা ছাত্রদের প্রাণে একটা 'বিলাতীভাব' আনিয়া দেয়। পোষাক-পরিচ্ছদ বাহিরের জিনিস, তাহাতে 'বিলাতী ভাব' একটু-আধটু আসিয়া গেলে তাহাতে এমন কিছু

যায় আসে না। মুস্কিল এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে তাহাদের, মনের গায়েই 'বিলাতী রঙ্' ধরিয়া যায়। আজকাল একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও হয়। যেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার আছে সেখানেও পরিবারেব মধ্যে আর আগেকার মিলনের ভাবটি দেখা যায়না। প্রত্যেকেই কেবল নিজের স্ত্রী-পুত্রের স্বার্থের জন্যই ব্যাকুল। উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরা নিজেদের পরিবার লইয়া পৃথক্ ভাবে কর্ম্মস্থলেই বাস করেন—সংসারের অন্যান্য পোষ্যদের উপর, এমন কি বৃদ্ধ পিতামাতার উপরও অনেকক্ষেত্রে কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন হইয়া থাকেন। ইউরোপীয়রা যেরূপ বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও অনেকেই ঐ জাতীয় বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার অনুরাগী হইয়া পড়িতেছেন।

বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলে বর্ত্তমান যুগে সম্মিলিত ভাবে (jointly) উহা পরিচালন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পরিচালকের উপর কাহারও বিশ্বাস থাকে না। সকলেই ভাগ বাঁটোয়ারার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যৌথ-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হইলে যে সকলের পক্ষেই ক্ষতি, আধুনিক শিক্ষার যুগে তাহা কেহই চিন্তা করেন না। একটি যৌথ-সম্পত্তি—যাহা একজন ম্যানেজার বা কর্ম্মচারীর দ্বারা পরিচালন করা চলে,—ভাগ-বাঁটোয়ারা হইলে যতগুলি ভাগ হয়, অংশীদারগণের ততগুলি কর্ম্মচারীর বেতন বহন করিতে হয়। চারিজন অংশীদারের একত্রে একজন কর্ম্মচারীর যে বেতন দিতে হইত, যৌথ-সম্পত্তি বিভাগ হইলে, স্পষ্টই দেখা যায়, তাহা চারিগুণ বৃদ্ধি পায়। এরূপক্ষেত্রে এক ব্যক্তি পরিচালক থাকিয়া যদি কিছু আত্মসাৎও করেন, তাহাতেও লোকসান নাই। কিন্তু একজন চোরের জায়গায় যদি চারিজন চোর নিযুক্ত করা হয়, তাহাতে কত বেশী ক্ষতি, ইহা অনুমান করা শক্ত নয়। এই

লাভ-লোকসান যে কেহই বোঝেন না, তাহা নহে। কিন্তু শরিক-গণের মধ্যে পরস্পরের এমন একটা জিদ্ ও হিংসাভাব দেখা যায় যে, সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও তাহাদের নিজেদের জিদ্ বজায় রাখিতেই হইবে। বরং একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্ন পৃথক হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যৌথ-সম্পত্তি বিভক্ত হইলে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ আছে।

আমি জানি, কোন একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের সম্পত্তি-বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে 'পার্টিসনের' মামলা রুজু হয়। দীর্ঘকাল মামলা চলিল, এটর্ণিগণের উদর ভর্ত্তি হইল, তারপর এটর্ণিরাই সালিশ নিযুক্ত হইয়া সম্পত্তি 'পার্টিসন' করিয়া দিলেন। কিন্তু এটর্ণি মহাত্মারা পারিশ্রমিকের যে বিল দিলেন, তাহা মিটাইতে গিয়া যে সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হইয়াছিল, সেই সম্পত্তিই বিক্রয় হইয়া গেল।

"যার যার তার তার"

এই যে বিচ্ছিন্ন-ভাব—শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেই এটা দেখা যায় বেশী। বর্ত্তমানে ঐ আদর্শের ছোঁয়াচ অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যেও আসিয়া লাগিয়াছে। আজ যাঁহারা এই আদর্শের সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রগণও যে উক্ত আদর্শ অনুসরণ করিবেনা, তাহা কে বলিতে পারে? শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের "যার যার তার তার" ভাবটা ইংরাজ জাতির আদর্শ হইতেই গৃহীত। কিন্তু ইংরাজ জাতির মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত গুণ আছে, শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কিছু অনুসরণ করেন না। কেবল তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন-যাত্রাটারই অনুকরণ করেন, যাহা আমাদের সংসারে মোটেই খাপ যায় না। ইংরাজ জাতির সংসার বলিতে স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যা। আর বাঙালী জাতির সংসার বলিতে মা, বাপ, ভাই, বোন, মাসী, পিশী—সব। ইংরাজেরা সকলেই উপার্জ্জন করে। যদি কেহ তাহা না পারে, তবে সে বিবাহও করে না।

আর বাঙালীর সংসারে হয়ত একজন উপার্জ্জনক্ষম, আর দশজন তাহার মুখাপেক্ষী। ইংরাজ জাতির মেয়েরা উপার্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে, কাহারও মুখাপেক্ষিনী হয় না, আর বাঙালীর ঘরের অনেক বিধবারা হয় পিতার সংসারে, না হয় স্বামীর সংসারে, কাহারও গলগ্রহ হইয়া জীবন যাপন করে।

আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষা

বর্ত্তমানে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সকলেরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। আমাদের আর্য্যনারীগণ সকলেই বিদুষী ছিলেন। খনা, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী—ইহাদের নাম কে না জানে? কিন্তু বর্ত্তমানে যে নারী-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কতটুকু সমর্থনযোগ্য ভাবিবার বিষয়। আধুনিক শিক্ষা নারীকে যেন নারীর আদর্শ হইতেই বিচ্যুত করিতে চলিয়াছে। নারী পুরুষ নয়, যেমনি পুরুষও নারী নয়। নারী গৃহের শ্রী—সেবা দিয়া, যত্ন দিয়া, স্বভাবের মাধুরী দিয়া সংসারকে সে আনন্দ-নিকেতন করিয়া তুলে। অন্ততঃ বাঙ্গালী পরিবারে তা'ই। নারী এখানে একাধারে "জননী, গেহিনী।" শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, সকলকে লইয়া তাহার সংসার। সে কাহাকেও তুষ্ট করে সেবা দিয়া, কাহাকে তুষ্ট করে বাৎসল্য দিয়া, কাহাকে তুষ্ট করে ভক্তি দিয়া। গৃহাগত অতিথি তাহার কাছে নারায়ণ। আর আধুনিক শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, নারী আজ আর গৃহিণী নয়, তিনি স্বামীর বিলাস-সঙ্গিনী। সংসারের আর পাঁচজনকে চিনিবার তাহার প্রয়োজন নাই, —চিনেনও না, স্বামী, পুত্র, কন্যা পর্য্যন্তই তাহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।

হিন্দু জাতির মধ্যে এতদিন 'ডাইভোর্স' অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল না। সম্প্রতি মহিলা-কংগ্রেসে এ প্রস্তাবও উঠিয়াছে। বুঝা গেল

এ সৌভাগ্যের জন্যও একদল নারী লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন! আদালতে এই জাতীয় মামলা পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার যদি এই পরিণতি হয়, তবে এ জাতির জাহান্নামে যাইতে আর বাকী কি?

আজকাল শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের ভিতর ধূয়া উঠিয়াছে—'শিক্ষিতা পাত্রী ছাড়া বিবাহ করিব না।' না করুন, কিন্তু এই ব্যয়-বহুল সভ্যতার যুগে, স্বামীর সঙ্কীর্ণ আয়ে, বর্ত্তমান আদর্শ ও আবহাওয়ায় বর্দ্ধিতা শিক্ষিতা স্ত্রীর যদি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হয়, তবে স্বামী-দেবতা কি করিবেন? আর হইতেছেও তো তা'ই।

যে শিক্ষায় চরিত্র-গঠনের প্রেরণা নাই, ভোগের সঙ্গে সংযমের বাধন নাই, আছে শুধু ভোগ-বিলাসের দুরাকাঙ্ক্ষ প্রবৃত্তি, যে শিক্ষার ফলে দেখিতেছি সবর্ণ-অসবর্ণ যুবক-যুবতীর মধ্যে অস্বাভাবিক প্রণয়, এমন কি পরস্পরের মিলন না ঘটিলে অনেকস্থলে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত হয়, সে শিক্ষাই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা, আর সেই শিক্ষাই কি আমাদের নারীদের—আমাদের মাতৃজাতির যোগ্যতার মাপকাঠি হইবে! ভাবিবার কথা! যদি এ শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন না হয়, তা হলে বাঙ্গালীর সংসারে একদিন নারীজাতির ভিতরে সেবা, যত্ন আতিথেয়তার যে উচ্চ আদর্শ ছিল—যাহার ফলে দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরেও একটা শান্তি-শ্রী বিরাজ করিত, তাহা অচিরেই লোপ পাইবে। বাঙালীর গৃহ হইবে—"যথারণ্যং তথা গৃহম্।"

বর্ত্তমান শিক্ষা ও ব্যবসায়

আধুনিক শিক্ষায় বাঙালী কোন্ পথে—এই প্রশ্নই বারংবার মনে উদিত হয়। শিক্ষা মানুষকে উন্নত করে, খাঁটি করে। যে ইংরেজদের অনুকরণ করিয়া আমাদের যুবক-সম্প্রদায় এত গর্ব্ব বোধ করেন, সেই ইংরাজ কিন্তু ব্যবসায়ে কদাচ প্রতারণার আশ্রয় লয় না।

ইংরেজ জাতি কখনও ব্যবসায়ক্ষেত্রে কাহাকে ঠকাইয়া লাভ করিতে চায় না। কোন মালের অর্ডার লইয়া খারাপ বা ভেজাল মাল সরবরাহ— ইহা ইংরাজ ব্যবসায়ীদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এই জন্যই অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইংরাজদের সুনাম বেশী। আর আমাদের শিক্ষিত বাঙালী-সম্প্রদায় কি করেন? যাঁহারা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা লোককে ঠকাইয়া কি উপায়ে দু'পয়সা লাভ করিবেন, এই উপায় উদ্ভাবনেই সর্ব্বদা সচেষ্ট। এই জন্যই শিক্ষিত বাঙালীর কোন ব্যবসায়ে জনসাধারণের বিশ্বাস নাই।

এই কলিকাতা সহরে শিক্ষিত বাঙালী-বাবুরা কতকগুলি বিবাহ মৃত্যু-ইন্‌সিওর কোম্পানী খুলিয়া পল্লী-গ্রামের কত দরিদ্র অনাথা বিধবার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে লোককে চাকুরী দিবার প্রলোভন দেখাইয়া একদল লোক (ইহারাও শিক্ষিত-সম্প্রদায়) মিথ্যা আফিস খুলিয়া লোকের নিকট হইতে টাকা ডিপজিট লইয়া কত লোককে যে ঠকাইতেছেন, দৈনিক সংবাদপত্রের আইন-আদালত'এর পাতা খুলিলেই তাহা দেখা যায়। আইনকে ফাঁকি দিয়া সাধারণ লোককে ঠকাইবার অভিনব ফন্দি শিক্ষিত লোকের মাথায় যত আসে, অশিক্ষিত লোকের মাথায় তাহার শতাংশের একাংশও আসে না। আর সভ্যতার চাল-চলন, অভাব-অভিযোগের মাত্রা যত বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রতারণার বিচিত্র বিচিত্র কৌশলও যেন তত বেশী আবিষ্কৃত হইতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষার দান

শুনিতে পাই, রাষ্ট্র-চেতনা (political consciousness) নাকি আমাদের বর্ত্তমান্ শিক্ষার একটা বিশিষ্ট দান। তা' হ'বে। কিন্তু যখনই দেখিতে পাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্র-নেতাগণ নিজ

নিজ প্রদেশের স্বার্থরক্ষার সতত যত্নবান্, আর আমাদের বাংলার শিক্ষিত নেতাগণ নিজ নিজ স্বার্থকে বড় করিতে গিয়া নিজ প্রদেশের স্বার্থকে বলি দিতে কুণ্ঠিত ন'ন, তখন মনে হয়, এও বুঝি আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষারই ফল! অন্যান্য প্রদেশের লোকের মধ্যে দেখিতে পাই, কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তাহাদের আগ্রহের সীমা নাই, আর বাংলার শিক্ষিত-সম্প্রদায় ঐ জাতীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানেও ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রাধান্য বজায় রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। আমি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষভাবে বলিতেছি, কারণ এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার যাঁহারা থাকেন, তারা সবই গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহাদের অসাধুতা, অনুদারতা ও স্বার্থ-সর্ব্বস্বতার জন্য যখন কোনও প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়, তখন লোকে তাঁহাদিগকেই বা শ্রদ্ধা করিবে কি করিয়া, আর তাঁহাদের শিক্ষারই বা মূল্য থাকে কোথায়? আর যে-দেশে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের এই প্রকার আদর্শ, সে দেশে অশিক্ষিত-সম্প্রদায়কে দোষ দিয়া লাভ কি? অশিক্ষিতেরা তবু ভাল, শিক্ষা পায় নাই বলিয়া তাহাদের ভগবানের ভয় আছে, ধর্ম্মের ভয় আছে, মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরকের চিন্তা আছে। অন্যায় করিতে গেলে তাহাদের বিবেক বাধা দেয়, বুক কাঁপে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাক্। টাকা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে এদেশে একদিন দলিল-পত্রের প্রয়োজন হইত না। আকাশের চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইত। সেই দেশে এখন দলিল, রেজেষ্টারী খত, বন্ধকী দলিল, কত কি হইয়াছে; কিন্তু এ বজ্র-আঁটুনিও টিকে কই? শিক্ষার প্যাঁচে সে সব দলিল-পত্রও উড়িয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় অন্যান্য ক্ষেত্রে নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে না পারিলেও

প্রতারণা-বিদ্যায় তাঁহারা যে সমস্ত কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের মৌলিকত্ব (originality) নাই, এমন কথা আর বলা চলে না। অবশ্য শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই প্রতারক একথা বলা আমার কদাচ উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু জনকতক লোকের পাপের জন্য যে সমস্ত জাতিই আজ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে!

শেষ কথা

এখানে উপসংহার করিব। যতদিন এই জাতির মনের ভোল না বদ্‌লাইবে, ততদিন এ জাতির উন্নতি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।" অতি সত্য কথা। স্বামিজীর ঐ কথাই আজ বাঙালীর জপমালা হওয়া উচিত। শিক্ষার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নাই—শিক্ষার প্রণালীর (system) বিরুদ্ধেই আমার নালিশ। দেশে সেই শিক্ষা চাই, যে শিক্ষা একটা গোটা মানুষ তৈরী করিয়া তুলে। শিক্ষা দিবে আমাদিগকে চরিত্র; শিক্ষা দিবে আমাদিগকে মনুষ্যত্ব; শিক্ষা দিবে আমাদিগকে শ্রদ্ধা—সত্যে শ্রদ্ধা, শিবে শ্রদ্ধা, সুন্দরে শ্রদ্ধা।

বাঙ্গালীকে অর্থে এবং সম্পদে আবার বড় হইতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? ব্যবসা-বাণিজ্যই তাহার একমাত্র উপায়। কিন্তু সে জন্যও চাই শিক্ষা—এমন শিক্ষা যাহা মনকে উদার করে, জাতীয় স্বার্থে প্রেরণা জাগায়, পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কাজ করিবার সামর্থ্য দেয়। ব্যবসায়ে সেইটিই প্রয়োজন। যতদিন বাঙালী স্বীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া লইতে না পারিবে, ততদিন এ জাতির কোনো কূলে স্থান মিলিবে না। রাজনীতি-ক্ষেত্রেই বল, আর ব্যবসায় ক্ষেত্রেই বল, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিতে না পারিলে এ জাতির উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত।

পরিশিষ্ট

বিবিধ ব্যবসায়

ধানের ব্যবসা—ফসলের সময় মাঘ-ফাল্গুন মাসে জমিদার ও মহাজনের ঋণ শোধের জন্য চাষীরা সস্তায় ধান বিক্রয় করে। ঐ সময় পল্লী-অঞ্চলের অনেক লোক ধান খরিদ করিয়া গোলায় মজুত রাখে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে প্রায়ই ধানের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন তাহা বিক্রয় করিলে ৬।৭ মাসে প্রতি টাকায় ৵০-৶০ হিসাবে লাভ হয়। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ধান খরিদ করিয়া কলিকাতার আড়তে কিম্বা চাউল-কলে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে প্রতি মণে ⁄০-৵০ লাভ হয়। যদি এক সময়ে বেশী মাল আমদানী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে হয়তো পড়্‌তা দামেই বিক্রয় করিতে হয়। এই ব্যবসায়ে মুনাফা অল্প হইলেও বেশী পরিমাণ ধান আমদানি করিতে পারিলে, গড়ে বেশ লাভ হয়। কোন দেশে যদি ফসল অজন্মা হয়, অ-বাঙালীরা তাহার সংবাদ লইয়া ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করাইয়া মজুত রাখিয়া দেয়। পরে যে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, সেই দেশে উহা বিক্রয় করিয়া লাভ করে।

চাউলের ব্যবসা—মাঘ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সাধারণতঃ চাউলের দর সস্তা থাকে। ঐ সময় অনেকে উহা খরিদ করিয়া মজুত রাখিয়া দেয়। চৈত্র মাসের মধ্যে যে সমস্ত চাউল বিক্রয় হয়, উহাতে ক্রেতা প্রতি মণে এক সের 'ঢল্‌তা' পায়। বৈশাখ হইতে ঐ 'ঢল্‌তা' প্রতি মণে ⁄।০ সের হয়, ইহাই চাউলের ব্যবসায়ের নিয়ম।

অনেক ব্যবসায়ী উহা খরিদ করিয়া মজুত রাখে। বর্ষাকালে চাউলের দর যখন বেশী হয়, তখন বিক্রয় করিলে লাভ বেশী হয়। ধান-চাউলের কাজে প্রায় লোকসান নাই এবং ইহার টাকাও বেশীদিন আট্‌কাইয়া থাকে না। ৫।৬ মাসের মধ্যে হয়তো শতকরা ১০।১২৲ টাকা লাভ হইতে পারে। বাজার-দর যদি বেশী চড়িয়া যায়, তাহা হইলে লাভ আরও বেশী হইতে পারে। কোন ব্যবসায়েরই লাভালাভ সবসময় একরূপ (constant) থাকে না।

তৈলের ব্যবসা—কলের তেল আমদানী হওয়ার ফলে বাংলার কুটীর-শিল্প ঘানির ব্যবসা প্রায় একরূপ লোপ পাইয়াছে। সরিষা হইতে কলে তেল প্রস্তুত করিতে হইলে যাহা প্রতিমণ ১৬৲ টাকায় পড়্‌তা হয়, ঘানিতে তাহার পড়্‌তা ২০৲ টাকার কমে হয় না। কাজেই কলের সহিত প্রতিযোগিতায় ঘানি চলিতে পারে না। কলে পেষা হইলে যে সরিষায় ৩/ মণে ১/ মণের অধিক তেল হয়, ঘানিতে পেষা হইলে তাহাতে ৸২ সেরে ৸৩ সেরের বেশী তেল হয় না। কাজেই ১৬৲ টাকায় যেখানে মণ পাওয়া যায়, সেখানে ২০৲ টাকা মণ খরিদ করিবার মত লোক পাওয়া যায় না। কানপুরের তেল-কলওয়ালাদিগের প্রতিযোগিতায় বাংলার কলওয়ালাদেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ রেলকোম্পানী কর্ত্তৃক ঢালা তেলের গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত গাড়ীতে ঢালা তেল ভর্ত্তি হইয়া বাংলায় সর্ব্বত্রই আমদানী হইতেছে। ইহাতে টীনের কোন খরচ নাই। রেলগাড়ী হইতে ঢালা তেল পীপা টীন ভর্ত্তি করিয়াই গুদামজাত করা চলিতেছে। কানপুর অঞ্চল হইতে তিন মণ সরিষা আমদানি করিতে ২।০ মাশুল লাগে। এই তিন মণ সরিষা হইতে প্রস্তুত ১/ তেল আমদানী হইলে মাত্র ৸০ আনা মাশুলে হয়। সুতরাং কানপুর-অঞ্চলে তিনমণ সরিষার মূল্য ১৫৲ টাকা হইলে উহা রেল-মাশুল সমেত কলিকাতায়

পৌঁছানো পর্য্যন্ত ১৭।০ আনা পড়্‌তা হয়। কিন্তু কানপুর হইতে তৈরী তেল আমদানি হইলে প্রতিমণ ১৫৮০ টাকায় কলিকাতায় পৌঁছায়। কাজেই কানপুর হইতে ঢালা তেল আমদানির ফলে বাংলার কল-ওয়ালারা শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে। সমগ্র বাংলার ঘানি-ব্যবসায়ের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন তেলকলওয়ালা ধনী হইতেছিল, হয়তো ইহা সেই লক্ষ লক্ষ ঘানিওয়ালাদিগেরই অভিশাপের প্রতিক্রিয়া।

লবণ—এই ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে লাভ নাই। লবণ খরিদ করিতে হইলে প্রতিমণে ১৷৴১০ গবর্ণমেণ্টকে 'কাষ্টম শুল্ক' দিতে হয়। লবণের মূল্য প্রতিমণ সাধারণতঃ ॥০ আনা। গ্রেহেম কোং, টারনার মরিশন, আবদুল্লা ভাই, জুম্মাভাই প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা লবণের আমদানী-কারক। 'কাষ্টম হাউসে' শুল্কের টাকা জমা দিয়া এবং উক্ত কোম্পানীদের লবণের মূল্য প্রদান করিয়া জাহাজ হইতে লবণ ওজন লইতে হয়। লবণ-ব্যবসায়ীদের লবণ খরিদ করিতে হয় নগদ টাকায়, কিন্তু বিক্রয় করিতে হয় ধারে। পাইকারী লবণ বিক্রয়ে ১০০ মণে ২।১৲ টাকার বেশী লাভ হয় না। বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধি না হইলে এই ব্যবসায়ে লাভ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে যে সমস্ত স্থানে নদীর জল লবণাক্ত, সেই অঞ্চলের লোকেরা আবার গরমের সময় নোনা জল জ্বালাইয়া লবণ প্রস্তুত করে। উহা হাটে বাজারে ১৲-১।০ বিক্রয় হয়। একজন লোক যে পরিমাণ লবণ বহন করিয়া লইতে পারিবে, সেই পরিমাণ লবণ বিক্রয় আইন-বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু যান-বাহনে বহন করিয়া বিক্রয় করিলে উহা 'আইন-বিরুদ্ধ' হইবে। পুলিশে ধরিলে উহাতে জরিমানা হয়।

ডাল-কলাই—সাধারণতঃ পশ্চিম-অঞ্চল হইতে অ-বাঙালীরা ইহা বেশী পরিমাণ আমদানী-করিয়া থাকে। এই সমস্ত ছোলা, মশুরী প্রভৃতি খরিদ করিয়া পূর্ব্বে আহিরীটোলা ও শ্যামবাজার অঞ্চলে

ডাউলের গোলায় ইহা জাঁতায় ভাঙ্গা হইত। বর্ত্তমানে গমভাঙ্গা মেসিনে ডাল-ভাঙ্গা কাজ চলিতেছে। ঐ সমস্ত ডাল মুদি-দোকানদারগণ পাইকারী দরে খরিদ করিয়া খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করে। সাধারণতঃ ইহাতে প্রতিমণে ৵০-৶০ লাভ থাকে। বাজার দরের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে লাভ-লোকসান হয়। ডাল কলাইয়ের দর ফসলের সময়, অর্থাৎ শীতকালে সস্তা থাকে। বর্ষাকালে ঐ দর প্রতিমণে ১৲ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কারণ আবাদ-অঞ্চলে বর্ষাকালে কোন প্রকার তরকারী পাওয়া যায় না। কাজেই ডাল ছাড়া তাহাদের উপায় থাকে না।

নারিকেল তৈল—এই ব্যবসা আমড়াতলার গুজরাটী কাচ্ছি মুসলমান ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ একচেটিয়া। উহারা কোচিন, কলম্বো হইতে উহা আমদানী করিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করে। কোচিন, কলম্বো অঞ্চল হইতে প্রত্যেকদিন বাজার-দরের টেলিগ্রাম আসে। উক্ত টেলিগ্রামের দর অনুযায়ী ইহাদের মালের ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং তদনুযায়ী এখানকার বাজার-দর কম বেশী হয়।

সুপারি, লঙ্কা, মশলা—এই সমস্ত মালও উক্ত ব্যবসায়ীরা আমদানী করিয়া বিক্রয় করে। এই সব ব্যবসায়ীরা এত প্রকাণ্ড ধনী যে, মরশুমের সময় সস্তাদরে প্রচুর পরিমাণে মাল মজুত রাখে। আর সমস্ত বৎসর ধরিয়া উহা বিক্রয় করে। এই কারণে এই সমস্ত ব্যবসায়ে উক্ত ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। অন্য কোন জাতির মধ্যে ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ইহারা বাজার-দরের এত খবর রাখে যে, ইহাদের কারবারে শুধু টেলিগ্রাম-ব্যয় ৩।৪ শত টাকা। এত খবর রাখে বলিয়াই জিনিষের উপর ইহারা এক এক সময় অসম্ভব লাভ করিয়া থাকে। জিরা, মরিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি জিনিষে হয় তো ৩০৲ টাকার খরিদ-মাল ৬০।৬৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেও দেখা যায়। ইহারা

দেশ-বিদেশের খবরের জন্য যেমনি খরচ করে, তেমনি লাভও করে। কোন্ দেশে কোন্ ফসল কি পরিমাণ জন্মিল, কোন্ দেশে অজন্মা হইল —ইহারা তাহার এত হিসাব রাখিয়া কাজ করে যে, আমরা তাহার খবরও রাখি না। হয়তো অপ্রচুর বৃষ্টির জন্য বাংলায় ধানের ফসল অজন্মা হইবে এরূপ আশঙ্কা দেখা দিল। এই অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই ইহারা রেঙ্গুণের ব্যবসায়িগণের সহিত সস্তাদরে চাউলের কণ্ট্রাক্ট করিয়া রাখে। বাজারের এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিয়া ব্যবসায় করে বলিয়াই এই সকল ব্যবসায়ীরা প্রকাণ্ড ধনী। ইহাদের মত একচেটিয়া ব্যবসায় আর কাহারও নাই। সম্প্রতি ইহাদের জুলুম এতটা চরমে উঠিয়াছে যে, বাঙালী ব্যবসায়ীরা গত ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) ৪নং শোভারাম বসাক ষ্ট্রীটে মহেশ্বরী ভবনে সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কর মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই জুলুমের প্রতিবাদ করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। (আনন্দবাজার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৪৪)।

ঘৃত—এই ব্যবসায় অধিকাংশ অ-বাঙালীর হাতে। বাংলার বাহির হইতে কলিকাতায় বৎসরে ৪।৫ কোটি টাকার ঘি আমদানি হয়। ইহার মধ্যে খাঁটী ঘি খুবই কম। কোন প্রকার ভেজাল না দিয়া খাঁটী ঘির ব্যবসা করিলে প্রতিমণে ৫।৬৲ টাকা লাভ হয়। ভেজাল দিলে মণে ১৪।১৫৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ঘৃত-সংগ্রহের প্রশস্ত সময়। ঐ সময়ে ঘির দর সস্তা থাকে এবং ইহা জমিয়া যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরা শীতকালে ঘৃত খরিদ করিয়া মজুত রাখিয়া দেয়, এবং সমস্ত বৎসর ধরিয়া বিক্রয় করে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ঘি জমে না। ঘি পাত্‌লা হইলে খরিদ্দার মনে করে উহা ভেজাল। প্রচুর পরিমাণে মূলধন না থাকিলে ঘির ব্যবসায়ে হাত দেওয়া চলে না। অন্ততঃ লক্ষ টাকা মূলধন হাতে থাকিলে আড়াই হাজার

মণ ঘি খরিদ করিয়া মজুত রাখা চলে। বাঙালীর মধ্যে ক'জন অত টাকা বাহির করিতে পারে? যাঁহাদের টাকা আছে, তাঁহারা আবার বিদেশে গিয়া এত ঝঞ্ঝাট করিতে ইচ্ছুক নহেন। কাজেই ইহার মধ্যে বাঙালী বড় নাই। খুরজা প্রভৃতি বড় বড় ঘির মোকামে অনেক অ-বাঙালী ধনী মহাজন গুদাম প্রস্তুত করিয়া টাকা লইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের গুদামে মাল মজুত রাখিলে ঘৃতের খরিদ-মূল্যের ৭৫ ভাগ টাকা তাহারা শতকরা ১০৲।১২৲ সুদে ধার দেয়। পরে যখন যে-পরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়, তখন সেই পরিমাণ মাল 'ডেলিভারি' দিয়া থাকে। কাজেই বাঙালী ব্যবসায়ীরা যাহা লাভ করিবে, ঐভাবে টাকার সুদ দিতে হইলে সে লাভ আর আসিবে না। কলিকাতার কোন ব্যাঙ্ক এই কাজে হাত দিতে সাহস করে না,কারণ বদ্ধ টীনে ঘির পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষ ভর্ত্তি হইয়া প্রতারিত হইবার আশঙ্কা আছে। বর্ত্তমানে অ-বাঙালীর মধ্যে বহুলোক ঘির ব্যবসা করিতেছে। কারণ সব ব্যবসা অপেক্ষা ইহাতে লাভ বেশী। যদি ত্রিশ সের খাঁটী ঘির মূল্য ৩০৲ টাকা হয়, আর উহাতে ২৪৲ টাকা দরের উৎকৃষ্ট ভেজি-টেবিল ঘি দশ সের মিশানো যায়, তবে প্রতিমণ ৩৬৲ টাকায় পড়্‌তা হয়। বাজারে এই ৩৬৲ টাকার পড়্‌তা ঘি ৪৮৲।৫০৲ টাকা দরে উৎকৃষ্ট ঘি বলিয়া অবাধে চলিয়া যায়। প্রতি মণে ১২।১৪৲ টাকা লাভ। টাকার দিক্ দিয়া বিচার করিলে শতকরা প্রায় ২৫৲ টাকা লাভ; বর্ত্তমানে আর কোন ব্যবসায়েই এ জাতীয় লাভ দেখা যায় না। ঘির ব্যবসায়ে লাভের মাত্রা বেশী থাকায় বাজারে ৩০।৪০ দিনের ডিউতে উহা বিক্রয় চলিতেছে। বাংলায় আড়তদারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে বাঙালীরা অনেকে পশ্চিমাঞ্চল হইতে ঐ সমস্ত ঘি আমদানি করিয়া মজুত রাখিয়া ব্যবসা চালাইতে পারে, এবং তাহাতে ভেজালও কম হইতে পারে। বাংলার এতগুলি টাকার ব্যবসার লাভ সবই অ-বাঙালীরা খাইতেছে।

আর বাঙালীরা ভেজাল ঘি খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'খাদি প্রতিষ্ঠান' ও 'আচার্য্য ডেয়রী সাপ্লাই কোং'কে নানাভাবে সাহায্য করিয়া এই প্রতিষ্ঠান দুইটিকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। 'আচার্য্য ডেয়রী সাপ্লাই কোং' পশ্চিম দেশে কোন কোন স্থানে "ক্রীম অপারেটর" মেশিন বসাইয়া কাঁচা দুধ হইতে মাখন প্রস্তুত করিয়া ঘির ব্যবসা করেন। কিন্তু বাজারের চাহিদা অনুসারে আমদানির ক্ষমতা নাই।

গব্য ঘৃত—গব্য ঘৃতও বাংলায় কম বিক্রয় হয় না। কিন্তু ইহার দরও যেমন বেশী, ইহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধেও তেমনি অনেকে সন্দিহান। বাংলার যুবক-সম্প্রদায় উক্ত "ক্রীম অপারেটার" মেশিন লইয়া পল্লী-অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে গো-দুগ্ধ আমদানী হয়, তথায় এই কাজ চলে কিনা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখেন, আমার মনে হয় হয়তো তাহারা সফলতা লাভ করিবেন। দুগ্ধে জল মিশ্রিত কিনা, তাহা দেখার দরকার নাই। দুগ্ধ-বিক্রেতারা মেশিনে দুগ্ধ ঢালিলে মেশিন ঘুরাইয়া যে পরিমাণ ক্রীম প্রস্তুত হইতে দেখা যাইবে, ক্রেতা ও বিক্রেতার লোকসান না হয় এমন ভাবে সেই ক্রীমের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া উহা হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া বাজারে যদি খাঁটী জিনিস দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো বাংলার একটা সমস্যা সমাধান হইতে পারে। দুধ হইতে মাখন উঠিয়া গেলে ঐ দুগ্ধে ছানা, ক্ষোয়াক্ষীর, দধি প্রস্তুত হইতে পারে। তবে তাহাতে কোন আস্বাদ থাকে না। ইউরোপে হইলে হয়তো মাখন-তোলা দুগ্ধ হইতে "সুগার অব মিল্ক্" প্রস্তুত হইত।

জামা-কাপড়ের ব্যবসা—বর্ত্তমানে এই ব্যবসার সংখ্যা সহরাঞ্চলে প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অল্প মূলধনে ক্ষুদ্রভাবে এই ব্যবসায়ে কিছুই হয় না। জামা-কাপড়ের বৈচিত্র্য (variety)

দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, বড় দোকান না হইলে খরিদ্দার সাধারণতঃ প্রবেশ করিতে চায় না। একখানি জামা ও একখানি কাপড় বিক্রয় করিতে হইলেও অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ রকমের জিনিস দেখাইতে না পারিলে খরিদ্দারের পছন্দ হয় না। উহাতে মালপত্র এত বেশী ঘাঁটা ঘাঁটি হইয়া যায় যে, অনেক মাল 'লাট্' হইয়া বিক্রয় হয় না। এই সমস্ত দোকানের মালিকেরা কি ভাবে মজুত মালের মূল্য ধরিয়া লাভ-লোকসান হিসাব করেন, তাহা বুঝি না। জামা-কাপড়ের দোকানে কর্ম্মচারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যয় অত্যন্ত বেশী। মালপত্র চুরি হইবারও যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। কোন প্রকার শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া এই ব্যবসা পরিচালন করা বড়ই কঠিন। এই কাজে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় কর্ম্মচারীর উপর। অসৎ প্রকৃতির কর্ম্মচারী যদি খরিদ্দারের সহিত যোগাযোগে কিছু মাল সরাইয়া দেয়, তাহা ধরিতে পারা শক্ত। বেশী ভিড়ের সময় খরিদ্দার কোন মাল কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেও অনেক সময় খোঁজ পাওয়া যায় না। বাঙালীরা জামা-কাপড়ের কারবারের সংখ্যা দিন দিন কেবল বাড়াইয়াই চলিয়াছে, ফলে দিন দিন গণেশ উল্টাইতেও নেহাৎ কম দেখা যায় না। সাধারণ লোকের ক্রয়-শক্তি যত কমিয়া যাইতেছে, জামা-কাপড়ের দোকানের সংখ্যা যেন ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত জামা-কাপড়ের দোকানের দিকে তাকাইলে মনে হয়, বাঙ্গালী যেন ব্যবসার নামে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। অ-বাঙালীরা গোটা-কাপড়ের ব্যবসায়ই করে, কাটা-কাপড়ের ব্যবসায় করে না। কাটা-কাপড়ের ব্যবসায় এই কলিকাতায় অ-বাঙালীর মধ্যে কয়খানি আছে? যে ব্যবসায়ে মজুত মালের হিসাব রাখা চলে না, অ-বাঙালীরা এমন বিশৃঙ্খল ব্যবসায়ে কদাচ হাত দেয় না। বর্ত্তমান দিনে এই ব্যবসায়ে কাহারও উন্নতি হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে

না। রিডাক্‌সন্ সেলের (Reduction sale) নোটিশ দিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করিলেও ইহার 'ষ্টক্' ক্লিয়ার হয় কিনা সন্দেহ। যদি ঠিকমত ইহার হিসাব-নিকাশ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, মাড়োয়ারীদের হুণ্ডির টাকা পরিশোধের মত মালও দোকানে নাই। মালিকের নিজস্ব মূলধন প্রথমেই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরে মাড়োয়ারীদের নিকট হইতে হুণ্ডিতে টাকা ধার লইয়া যতদিন সম্ভব কারবার চলে। সর্ব্বশেষে কলিকাতার নিলাম-বিক্রেতা ২নং ম্যাকেঞ্জিলাল, হরলালকা কোং কর্ত্তৃক মজুত মাল নীলাম হইতে দেখা যায়। মাড়োয়ারীরা হুণ্ডিতে যে-সমস্ত টাকা ধার দেয়, তাহাতে তাহাদের প্রায় লোকসান হয় না। কারণ, উহাদের সহিত প্রথম হুণ্ডির কারবার করিতে হইলে যত টাকা ধার লওয়া হয়, তাহার শতকরা ১০৲ হিসাবে "গদী-সেলামী" দিতে হয়। অবশিষ্ট টাকার শতকরা ১৫৲ টাকা সুদের দরুণ অগ্রিম কাটিয়া লইয়া, যাহা প্রাপ্য হয় তাহাই খাতককে প্রদান করে। মোট কথা, পাঁচ হাজার টাকা ধার লইলে চারি হাজার টাকার বেশী খাতক পায় না। কিন্তু 'গরজ বড় বালাই', এই প্রকার ধার করা ভিন্ন উপায় নাই। একটা দোকান হইতে যদি ৩।৪ বৎসর এইভাবে সুদের টাকা আদায় হয়, তাহা হইলে মহাজনের আসল টাকা উঠিয়া যায়। পরে 'হরলালকা' কর্ত্তৃক নিলাম-বিক্রয়ে যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। কলিকাতার বাড়ীওয়ালারা আরও হুঁসিয়ার। তাঁহারা রোজের ঘর-ভাড়া রোজ আদায় করিয়া থাকেন। সুতরাং কেহ দোকান বন্ধ করিলে তাঁহাদের কোন লোকসান নাই। মাসকাবারী টাকা আদায় করিতে হইলে বিলে এক আনার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, দৈনিক ভাড়া আদায় হইলে ঐ ব্যয়টাও নাই।

মুদি দোকান—এই কারবার এক প্রকার মন্দ নহে। যদিও প্রতিযোগিতার দরুণ বাকীতে মাল বিক্রয় করিয়া ইহাতে আর পূর্ব্বের

মত লাভ নাই, তথাপি ভাল পল্লী বাছিয়া দোকান করিতে পারিলে, এখনও লাভ হইয়া থাকে। কলিকাতায় মুদি দোকানে সাধারণতঃ চাউল, ডাউল, আটা, ময়দা, তৈল, ঘৃত চিনি প্রভৃতি এই কয়েকটি জিনিষ রাখিলেই চলে। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে মুদি দোকানে ইহার উপর মশলা, কড়া, বাল্‌তি, হেরিকেন প্রভৃতি বিবিধ জিনিষ রাখিতে হয়। কলিকাতায় মুদি-দোকান; খুচরা মশলার দোকান, ষ্টেসনারী দোকান, পৃথক পৃথক ভাবে চালান হয়। পল্লীগ্রামে উক্ত তিন রকমের কারবার একত্রে পরিচালন না করিলে সুবিধা হয় না। তাহাতে অবশ্য একটা সুবিধাও আছে। প্রত্যেক জিনিষে কিছু কিছু লাভ হইলে মোটের উপর পোষাইয়া যায়। তবে এক সঙ্গে এতগুলি মালের ব্যবসা চালাইতে হইলে রীতিমত অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকটি মালের খরিদ-দর মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইবে, এবং মাল আনিতে যাহা খরচ হইয়াছে, তাহাও উক্ত মালের খরিদ-দরের সহিত একত্রে পড়্‌তা করা আবশ্যক। নতুবা খরিদ্দার উপস্থিত হইলে, মাল-খরিদ চালান দেখিয়া যদি বিক্রয়-দর বলিতে হয়, বিলম্বের দরুণ খরিদ্দার হয়তো বিরক্ত হইতে পারে। তা'ছাড়া চতুর খরিদ্দার দোকানদারের অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধাপ্পা দিয়া সস্তায় মাল খরিদ করিতেও চেষ্টা করে। পাশাপাশি দোকানে ঐ সমস্ত মাল কি দরে বিক্রয় হইতেছে, সে সংবাদ রাখিতে হইবে। নচেৎ চতুর খরিদ্দারের হাতে ঠকিতে হয়। আমার জনৈক বন্ধু চিরকাল সম্পত্তি পরিচালন করিয়া শেষকালে এক মুদি-দোকান খুলিয়াছেন। তিনি নিজে ত ব্যবসায়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ, তদুপরি কর্ম্মচারী যে ক'টি রাখিয়াছেন, তাহারাও কিছুই বোঝে না। আমি তাঁহাকে এই জাতীয় ব্যবসায় করিতে নিষেধ করিয়া মোটামুটি বাঁধি মালের কাজ করিতে উপদেশ দিই। কিন্তু তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল না, তিনি প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, "ধারে মাল

বিক্রয় করিব না"। কিন্তু এক মাসের মধ্যে ১৫০।২০০৲ টাকা ধার পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার দোকানে অনেক চতুর খরিদ্দার জুটিয়া গিয়াছে। খরিদ্দারগণ জানে যে, ছোটবাবুকে ঠকাইয়া লওয়া কঠিন কাজ নয়। খরিদ্দার প্রথম দিনে ১০৲ টাকা পরিমাণ মাল ওজন করিয়া হয়তো বলিল, "ছোটবাবু! এখন আমার কাছে ৮॥০ টাকার বেশী নাই, বাকী ১॥০ টাকা আগামী পরশ্ব মাল লইতে আসিলে দিয়া যাইব।" ছোটবাবু দেখিলেন, "তাইতো, ১০৲ টাকার মালে মাত্র ১॥০ টাকা বাকী থাকিতেছে, ইহাতে লোকসান কি?" খরিদ্দার মাল পাইল। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে উক্ত খরিদ্দার পুনরায় মাল লইতে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে উক্ত ১॥০ পরিশোধ করিয়া তারপর ২০৲ টাকার মাল ওজন করিয়া লইয়া ১৫৲ টাকা দিয়া বলিল, "বাকী টাকা পাঁচটা আগামী দিনে দিব।" পর পর খরিদ্দার বেশী বেশী টাকার মাল লইতে লাগিল এবং টাকাও বেশী ধার চলিতে লাগিল। কাজেই ছোটবাবুর প্রতিজ্ঞা আর টিকিল না। তিনি এখন ধারে মাল বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। কোন খরিদ্দার আসিয়া হয়তো জিজ্ঞাসা করিল, "চিনির দর কত? বলা হইল ৭।০, খরিদ্দার হয়তো বলিয়া বসিল, "বলেন কি? অমুক দোকানে ৭৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে, আপনার এখানে আসিয়া তো ভাল কাজ করি নাই।" ছোটবাবু ভয়ে ভয়ে খরিদ-চালান খুলিয়া দেখিলেন যে, ৬৸৵০ দরে চিনি খরিদ আছে। মনে মনে হিসাব করিয়া ভাবিলেন, ৭৲ টাকা দরে বিক্রয় করিলে প্রতিমণে ৵০ আনা মাত্র লাভ হয়। এখন নূতন কারবার, খরিদ্দার সংগ্রহের জন্য প্রথমটা কম লাভেই মাল বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা ছোট বাবুর খেয়াল হইল না যে, মাল আনার নৌকা-ভাড়া, গাড়ী-ভাড়া বাবতে যে চারি আনা খরচ হইয়াছে তাহা ধরিয়া ৭৵০ পড়তা হইয়াছে, সুতরাং সেই মাল ৭৲ টাকায় বিক্রয় করিলে ৵০ লোকসান হইল। যাক্, ঐ কারবার

আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "এক বৎসরের মধ্যে তোমার মূলধন নষ্ট হইবে।" কিন্তু এক্ষণে যে নীতিতে কারবার চলিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, অত সময়ও লাগিবে না, মূলধন হারাইয়া শীঘ্রই দোকান গুটাইতে হইবে। * এই সমস্ত কারণেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিয়া কোন ব্যবসা করা উচিত নহে।

খুচরা মশলার দোকান—ইহাতে লাভ আছে বটে, কিন্তু এই কারবারে অসংখ্য প্রকারের মাল রাখিতে হয়। রীতিমত ওস্তাদ লোক না হইলে এ কারবার চলে না, কারণ এক পয়সার জিনিষের মধ্যে তিন রকমের মশলা দিয়াও আবার একটা পেঁয়াজ ফাও দিতে হয়। হাত ঘুরাইয়া কাগজের মোড়ক করাই ইহার কায়দা। খুচরা মশলার কারবারে কর্ম্মচারী রাখিয়া স্থবিধা হয় না। যাহারা মশলার দোকানে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিয়া নিজে দোকানদারী করিতে পারিবে, তাহাদেরই খুচরা মশলার কাজ করা উচিত। অন্যের পক্ষে এ কারবার করাতে ঝুঁকি আছে।

ষ্টেশনারী মণিহারী দোকান—এই কারবারেও অসংখ্য রকমের মাল রাখিতে হয়। প্রত্যেক জিনিসের খরিদ ও বিক্রয় দর সমস্ত মুখস্ত থাকা চাই। ইহার সব জিনিসে সমান লাভ হয় না। দুই টাকার জিনিসে হয়ত ৷৴১০ লাভ হয়, আবার চারি আনার জিনিষেও হয়তো ⁄০ আনা লাভ হইয়া থাকে। খরিদ-বিক্রয়ে খুব অভিজ্ঞতা না থাকিলে, এই কাজ কোন নূতন লোকের দ্বারা চলিতে পারে না। ষ্টেসনারী দোকানে 'ষ্টক্' রাখা চলে না। কোন জিনিস চুরি হইলে ধরিবার উপায় নাই। মালিক নিজে কারবার না করিতে পারিলে, কর্ম্মচারী রাখিয়া এই কাজে স্থবিধা হয় বলিয়া বিশ্বাস করি না। তবে

* এই পুস্তক মুদ্রণকালে খবর পাইলাম, দোকান বন্ধ হইয়াছে।

যদি বড় রকমের পাইকারী বিক্রয়ের ষ্টেসনারী দোকান হয়, তাহা কর্ম্মচারীর দ্বারাও চলিতে পারে। কিন্তু পাইকারী অপেক্ষা খুচরা বিক্রয়ে লাভ বেশী হয়। পল্লীগ্রামে যাহারা হাটে-বাজারে মণিহারী মাল বিক্রয় করে, যাহাতে মাল চুরি না যায় সেজন্য একজনকে পাহারা দিতে হয়।

খাবারের দোকান—উপযুক্ত পল্লী বাছিয়া এবং উপযুক্ত কারিগর রাখিয়া বিশুদ্ধ ঘৃতে খাবার প্রস্তুত হইলে খাবারের দোকানে টাকায় তিন আনা লাভ হয়। কিন্তু যে দিনের প্রস্তুত খাবার যদি সেই দিনের মধ্যে বিক্রয় না হয়, তবে সুবিধা হয় না। বাসী খাবার বিক্রয় করিলে তা'তে যদি একবার দুর্ণাম হইয়া পড়ে, তবে সে দোকানে আর খরিদ্দার যায় না। খাবারের দোকান সর্ব্বদাই এরূপ সাবধানে সব দিক্ লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালন করিতে হয়, যেন কোন প্রকারে খরিদ্দারদের খারাপ ধারণা না আসিতে পারে। এই সব কারবারে মিউনিসিপ্যালিটির কিম্বা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের স্যানিটারী ইনস্পেক্টারগণ সর্ব্বদা জিনিসের নমুনা লইয়া পরীক্ষা করিয়া থাকে। পরীক্ষায় কোন প্রকার ভেজাল প্রমাণ হইলে জরিমানা হয়, এবং উহা সাধারণ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িলে সে দোকানের পশার একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়।

কাঠের ব্যবসা—মেসার্স জার্ডিন স্কিনার, গ্লিণ্ডার কোম্পানী, বোম্বে বার্ম্মা টেডিং কোম্পানী, রেঙ্গুন হইতে সেগুন, জারুল, লোহাকাঠ পাইন কাঠ আমদানী করিয়া শালিমার গঙ্গার ধারে রাখিয়া বিক্রয় করে। এই সকল কোম্পানী যে সমস্ত কাঠ আমদানী করিয়া থাকে, তাহাকে 'ইংলিশ মার্কা' বলে। এই সমস্ত কাঠ উৎকৃষ্ট এবং ইহার দরও বেশী। ইহাদের কাঠ অসার বা চেরা-ফাটা থাকে না। ভাল বাছাই করা, পাকা গাছ চেরাই হয় বলিয়া ইহাদের আমদানী কাঠ ভাল হয়। কিন্তু মাড়োয়ারীরা যে সমস্ত কাঠ আমদানী করে, উহাতে যথেষ্ট

ফাটা ও অসার থাকে। কারণ মাড়োয়ারীরা যে সমস্ত জঙ্গলের কাঠ খরিদ করে, উহা ভাল নহে। তজ্জন্য 'ইংলিশ মার্কা' কাঠের দরে আর মাড়োয়ারীদের কাঠের দরে টন প্রতি প্রায় ৩০।৪০৲ টাকা তফাৎ থাকে। পূর্ব্বে কাঠের ব্যবসা সকলের পক্ষেই বিশেষ লাভের ছিল। এক্ষণে এ ব্যবসা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তথাপি যাহারা রেঙ্গুন হইতে মাল আমদানী করে, তাহারা এখনও ইহাতে যাহা লাভ করে, বাঙ্গালী কাঠগোলা-ব্যবসায়ীরা তাহার এক ভগ্নাংশও করিতে পারে না। বাঙ্গালীর পক্ষে এ ব্যবসা এখন কাটা-কাপড়ের ব্যবসার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ ইংরাজ কোম্পানী কিম্বা মাড়োয়ারীর মধ্যে যাহারা কাঠ আমদানী করে, তাহারা লট্ হিসাবে বিক্রয় করিয়া প্রতি টনে ৩০।৪০৲ লাভ করিয়া থাকে। আর বাঙ্গালী কাঠগোলা-ব্যবসায়ীরা উহা টুক্‌রা করিয়া দরজা, জানালা, ফার্ণিচার প্রস্তুত করে। মাড়োয়ারীরা কাপড়ের গাঁট আমদানী করিয়া থান বিক্রয় করে, আর বাঙ্গালীরা সেই থান কাটিয়া দরজির দ্বারা জামা তৈয়ারী করিয়া কাটা কাপড়ের দোকান চালায়। কাঠের ও কাটা কাপড়ের ব্যবসা উভয়ই এক প্রকার। ইহার কোনটাতে 'ষ্টক্' ঠিক রাখা চলে না। কাঠের ব্যবসায়ে পূর্ব্বে যে প্রকার লাভ ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। প্রতিযোগিতার চাপে পড়িয়া খরিদ্দারদের কেবল ধার দিতে হয়। কেহ গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্ল্যান পাশ করিতে দিলে, কাঠগোলা-ব্যবসায়ীরা তাহার সংবাদ লইয়া উহার অর্ডার সংগ্রহ করিতে পূর্ব্ব হইতেই মালিকের বাড়ী ছুটাছুটি করিয়া থাকে। খোসামোদ করিয়া কাজ লইতে হইলে তাহাতে একদিকে যেমন ধারী দিতে হয়, অপরদিকে তেমনি তাহাতে লাভও থাকে কম। কাঠের ব্যবসায়ে ইংরাজ কোম্পানী ও মাড়োয়ারীরা যেন তণ্ডুল ভোগ করিতেছে, আর বাঙালীরা যেন তাহার তুষ নিয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে।

এক সময়ে কাঠের ব্যবসায় ছিল প্রচুর লাভের, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতিযোগিতায় উহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে ব্যবসায়ে লাভ দেখা যায়, সকলেরই সেই দিকে ঝোঁক্ পড়ে, ফলে ভয়াণক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়া সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নিমতলা, শ্যামবাজার অঞ্চলের বহু পুরাতন বড় বড় কাঠের গোলা এই প্রতিযোগিতার চাপে পড়িয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

শাল-কাঠের জঙ্গল লইয়া যদি রেলওয়ে, কলিয়ারী প্রভৃতিতে কন্ট্রাক্ট্ করিয়া কাঠ সাপ্লাই (supply) করা যায়, তাহা হইলে বেশ লাভ থাকে। কিন্তু ইহাতে বড় পরিশ্রম। তজ্জন্য বাঙালীর মধ্যে এই ব্যবসায়ে খুব অল্প লোকই দেখা যায়। দুই একজন যাঁহারা এই কাজ করেন, তাঁহারা বেশ উন্নতি করিয়াছেন। অ-বাঙালী বহু লোক এই কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থশালী হইয়াছে। হাজারীবাগ রোড্ ষ্টেসনে খাজান সিং নামক জনৈক পাঞ্জাবী শাল-কাঠের জঙ্গল খরিদ করিয়া প্রচুর অর্থশালী হইয়া পড়িয়াছে। আসানসোলে কতকগুলি অ-বাঙালী এই ব্যবসায়ে বেশ উপার্জ্জন করিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ অ-বাঙালীরা যে প্রকার অনুসন্ধিৎসু ও পরিশ্রমী, বাঙালীরা তাহার কিছুই নহে। বাঙালীরা যদি বিদেশে বাহির হয়, তবে কোথায় থাকিব, কি খাইব এই ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়ে। আর অ-বাঙালীরা লোটা কম্বল সম্বল করিয়া কোন্ দূর মুলুক হইতে বাংলায় আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে।

শেয়ার মার্কেট—যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক, অথচ বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাটে যাইতে রাজী নয়, তাহাদের পক্ষে শেয়ার খরিদ, বিক্রয়, দালালী করা ভাল। ইহাতে একটু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী লোক হওয়া দরকার। কারণ পৃথিবীর বাজারের সংবাদ রাখিতে

না পারিলে শেয়ার মার্কেটে কাজের সুবিধা হয় না। শেয়ার মার্কেটে যাহারা অভিজ্ঞ বড় বড় ব্যবসায়ী, প্রথমতঃ তাহাদের নিকট থাকিয়া কিছুকাল কাজ শিক্ষা করিতে হইবে। যাহারা অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা মূলধন বাহির করিতে সক্ষম, তাহাদের পক্ষে শেয়ার মার্কেটে কাজ করা মন্দ নহে। এই ব্যবসায়ে মূলধন যত বেশী হয় ততই সুবিধা। অ-বাঙালীদিগের মধ্যে শেয়ার মার্কেটে অনেক কোটীপতি ধনীও আছে। পাঁচ হাজার টাকা মূলধনে শেয়ার মার্কেটে কাজ আরম্ভ করিলে, এবং অতিরিক্ত লোভের বশবর্ত্তী না হইলে গড়ে বারমাসে বারশত টাকা উপার্জ্জন করা চলে। কখনও বা ইহার বেশীও হইতে পারে। এই ব্যবসায়ে আফিস, গদী, গুদাম বা কর্ম্মচারীর কোন আবশ্যকতা নাই, আফিসের ন্যায় ১০টা ৫টায় ইহার কাজ। ইহাতে লাভেরও যেমন সম্ভাবনা, না বুঝিয়া ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করিতে গেলে তেমনি ইহাতে লোকসানের আশঙ্কাও যথেষ্ট। তজ্জন্য ইহাতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বিশেষ প্রয়োজন। বেশী লাভের আশায় ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করিতে গিয়া শেয়ার মার্কেটে অনেককে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। কারণ এই ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম যাহারা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাদের লালসা এত বাড়িয়া যায় যে, অনেক সময় লোকসানের কথা আর তাহাদের মনেই থাকে না। শেয়ার মার্কেটে ব্যবসায় করিতে হইলে মূলধনের টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া চল্‌তি হিসাব (current account) খুলিতে হয়। যখন যে শেয়ারের বাজার-দর কম থাকে, তাহার কিছু কিছু শেয়ার খরিদ করা উচিত। এক প্রকারের শেয়ার বেশী খরিদ না করিয়া বিবিধ প্রকারের শেয়ার খরিদ করা ভাল। ইহাতে সুবিধা এই যে, পাঁচ রকমের শেয়ার খরিদ থাকিলে, হয়ত কোনটির

দর হ্রাস হইল এবং কোনটি চড়িয়া গেল, তাহাতে ষোল আনাই লোকসানের আশঙ্কা থাকে না।

কোন সময় শেয়ার খরিদ করিয়া টাকার অভাব হইলে, ব্যাঙ্ক উক্ত শেয়ার বন্ধক রাখিয়া শতকরা ৫।৬৲ টাকা সুদে শেয়ারের বাজার-দরের ৭০।৭৫৲ টাকা ধার দিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের নিকট এই ভাবে টাকা প্রাপ্তির সুবিধা থাকায়, অনেকে পাঁচ হাজার টাকা মূলধনে ২০।২৫ হাজার টাকার শেয়ার খরিদ করিয়া বসে। কিন্তু ঐরূপ দুঃসাহস করা উচিত নহে। অনেক সময় উহাই ধ্বংসের কারণ হইয়া পড়ে। কারণ যদি শেয়ারের মূল্য হ্রাস হইতে থাকে, তাহা হইলে, যে পরিমাণে দর হ্রাস হইবে, শেয়ার ক্রেতার সে পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্ককে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। নতুবা লোকসানের আশঙ্কায় ব্যাঙ্ক যে-কোন দরে উহা বিক্রয় করিয়া নিজেদের প্রদত্ত টাকা সুদ-সমেত ওয়াশীল করিয়া লয়। ব্যাঙ্ক যখন বন্ধকী শেয়ার এইভাবে বাজারে বিক্রয় করে, তখন উহার বাজার-দর আরও কমিয়া যায়। ইহার ফলে শেয়ার মার্কেটে অনেক ব্যবসায়ীকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। যাহারা এই সকল কম দরের শেয়ার খরিদ করিয়া রাখিতে পারে, তাহারাই পরে বেশ লাভ করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের নিকট শেয়ার বন্ধক রাখিয়া কাজ করিতে হইলে এমন অর্থবল থাকা আবশ্যক, যাহাতে শেয়ারের মূল্য হ্রাস পাইলেও, ব্যাঙ্ককে হ্রাসমূল্য প্রদানে যতদিন ইচ্ছা শেয়ার ধরিয়া রাখা চলিতে পারে। সে ক্ষমতা না থাকিলে শেয়ারের কারবারে ধ্বংস হইতে হইবে। এই কারণে শেয়ার মার্কেটে কাজ করিতে গেলে অল্প মূলধনে অতিরিক্ত লাভের আশা করা কখনই উচিত নহে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের বাড়ী-ঘর, সম্পত্তি থাকে, তাহারা উহা সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখিয়াও আশু

বিপদ পাইতে পারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা একেবারে মারা যায়। কিন্তু যদি বিবিধ প্রকারের শেয়ার খরিদ থাকে, তাহা হইলে এই জাতীয় আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা হইবার উপায় আছে। কারণ সকল প্রকার শেয়ারের দর একই সময়ে হ্রাস হয় না, কোন কোন শেয়ারের মূল্য হয় সমান সমান (non-fluctuating) থাকে, কিংবা সামান্য কিছু হ্রাস হইতেও পারে। হঠাৎ বিপদ হইলে ঐ সমস্ত শেয়ার সামান্য কিছু লোকসানেও বিক্রয় করিয়া দিলে ব্যাঙ্কের হ্রাস-মূল্য পূরণ করিয়া দেওয়া চলে। কারণ ব্যাঙ্ক শেয়ারবন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়ার সময় মূল্য-হ্রাসের আশঙ্কায় শতকরা ২৫৷৩০৲ টাকা হাতে (margin) রাখিয়া ধার দেয়।

পাঁচ হাজার টাকা যাহার মূলধন, সাত আট হাজার টাকার বেশী শেয়ার এককালীন তাহার খরিদ করিতে নাই। তাহা হইলে যদি শেয়ারের মূল্য শতকরা ২০৲ টাকা হারেও হ্রাস হয়, তাহাতেও ক্ষতিপূরণ করিতে আটকায় না এবং যদি একটু দীর্ঘকালও উক্ত শেয়ার ধরিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে যাহা ডিভিডেণ্ড পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ব্যাঙ্কের সুদ পোষাইয়া যায়। যাহারা অল্প মূলধনে শেয়ার মার্কেটে ব্যবসায় আরম্ভ করিবে, তাহাদের পক্ষে অধিক মূল্যের অল্প শেয়ার খরিদ না করিয়া কম মূল্যের অথচ ডিভিডেণ্ড বেশী —এই প্রকার শেয়ার খরিদ করা উচিত। কারণ যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য অধিক তাহার দর যেমন হঠাৎ বৃদ্ধি পায়, তেমনি আবার হঠাৎ হ্রাসও হয়।

অনেক সময় শেয়ার মার্কেটে বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীরা চতুরতার সহিত বাজার-দর হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের যদি কোন শেয়ার কম মূল্যে খরিদের প্রয়োজন হয়, তবে তাহারা নিজেদের কতকগুলি শেয়ার কিছু লোকসান

করিয়াও বাজারে কম দরে বিক্রয় করিয়া সাধারণকে ঘাবড়া দেন। তাহাতে অন্যান্য সকলে যখন কম দরে শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ করে, তখন ঐ সমস্ত শেয়ার অন্যের হাত দিয়া পরোক্ষভাবে আবার তাঁহারাই খরিদ করিয়া থাকেন। তেমনি আবার ঐ সমস্ত শেয়ার বিক্রয়ের দরকার হইলে উক্ত ব্যবসায়ীরা চড়া দরে সাধারণের নিকট হইতে কিছু শেয়ার নিজেরা খরিদ করিয়া বাজারে একটা হুজুগ সৃষ্টি করিয়া পরোক্ষভাবে নিজেদের শেয়ার দালাল দিয়া বিক্রয় করেন। চতুর ব্যবসায়ীরা ইহাতে ভীত হয় না। কিন্তু যাহারা বাহিরের লোক, লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সময় সময় কিছু শেয়ার খরিদ করিয়া রাখে, তাহারাই কেবল তখন হুজুগে পড়িয়া খরিদ-বিক্রয় করে। এই ভাবে শেয়ার মার্কেটে বাজার-দরের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রত্যেক দিনই চলিতেছে।

কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেক অর্থশালী লোক কেহ ডিভিডেণ্ড ভোগ করিতে, কেহ বা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে শেয়ার খরিদ-বিক্রয় করেন। ঐ সমস্ত গ্রাহক জুটাইয়া খরিদ-বিক্রয় করিতে পারিলে তাহাতে শেয়ার প্রতি ৵০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত দালালী লাভ হয়। মোট কথা, নিজের ক্ষমতানুযায়ী হিসাব করিয়া কাজ করিতে পারিলে, শেয়ার-ব্যবসায়ে লাভ ছাড়া লোকসান হয় না। বর্ত্তমানে ইহার অবস্থা অবশ্য খুব শোচনীয়।

এজেন্সী ব্যবসায়—কলিকাতায় অনেক কোম্পানী আছে, যাহারা দেশের সর্ব্বত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মাল বিক্রয় করে। এজেণ্টের নিকট যত টাকার মাল মজুত রাখা আবশ্যক, সেই পরিমাণ টাকা ডিপজিট লইয়া এজেন্সী দেওয়া হয়। কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট হারে উক্ত টাকার সুদ প্রদান করে। মাল বিক্রয় হইলে কোম্পানীর নির্দ্ধারিত তারিখে কমিশন বাদ দিয়া মূল্য শোধ করিতে হয়।

ইহাতে কোম্পানীর বিশেষ সুবিধা। কারণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া মাল বিক্রয় করিতে হইলে, তাহাতে তাহাদের বেতন, যাতায়াত-ব্যয় এবং খরিদ্দারকে ধারে মাল বিক্রয় প্রভৃতি অনেক প্রকারের দায়িত্ব লইতে হয়। আর এজেন্টকে সামান্য কমিশন দিলে বেশী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা মাল বিক্রয়ের জন্য যে ভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করে, কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। অথচ ইহাতে কোম্পানীর টাকা নষ্ট হইবারও ভয় নাই, কারণ মালের মূল্য ডিপজিট রাখিয়াই এজেন্টকে মাল দেওয়া হয়।

অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা ইহাতে দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট অনেকটা কম আছে। বাজার-দর হ্রাস বৃদ্ধির সহিত এজেন্টের লাভালাভের কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত দরে মাল বিক্রয় করিতে হয়। অনেক এজেন্ট বেশী পরিমাণ মাল বিক্রয়ের জন্য সময় সময় নিজেদের কমিশন হইতে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া থাকে। এজেন্ট যত বেশী পরিমাণ মাল বিক্রয় করিতে পারে, লাভও তত বেশী হয়। অনেক কোম্পানী গুদামভাড়া, লাইসেন্স, কাগজ, পেনসিল প্রভৃতি ষ্টেসনারি জিনিষ সরবরাহ করিয়া থাকে। মাল বিক্রয় হইলে কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী দৈনিক বা সাপ্তাহিক রিপোর্ট দিতে হয়। এজেন্ট যদি ধারে মাল বিক্রয় করে, তজ্জন্য কোম্পানীর কোন দায়িত্ব নাই। কোম্পানীকে মালের অর্ডার দিলে, তাহারা নিজেরাই উহার মাশুল প্রদানে এজেন্টের মোকামে পাঠাইয়া দেয়।

বার্ম্মাশেল্ অয়েল কোম্পানী ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর দেশের ছোট-বড় বহু ব্যবসায়-কেন্দ্রে এজেন্ট নিযুক্ত আছে। এই সকল কোম্পানী কেরোসিনের প্রতি টীনে ।০ আনা হিসাবে কমিশন দেয়। গুদামভাড়া, লাইসেন্স, খাতাপত্র প্রভৃতি ষ্টেসনারিও দিয়া থাকে। যে মোকামে যে দরে মাল বিক্রয় হইবে, তাহা কোম্পানী স্থির করিয়া দেয়।

ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং'র ভারতের সর্ব্বত্র এজে আছে। ইহাদের সিগারেট সর্ব্বত্রই ঐক দরে বিক্রয় হয়। মাল পাঠাইতে প্রতিমণে ১০৲ টাকা মাশুল লাগে, তথায়ও যে আবার ১৲ টাকা মাশুল লাগিলেও সেই একই দরে মাল বিক্রয় হইবে। টাকা ডিপজিট্ সম্বন্ধে এই কোং'র বিশেষ কোন নিয়ম নাই। অর্ডার অনুযায়ী মালের মূল্য নগদ দিলেই চলে। মাল পাঠাইবার মাশুল কোম্পানী দিয়া থাকে। ইহারা গুদামভাড়া বা অন্য কোন খরচ দেয় না। ইহাদের মালের তারতম্য অনুসারে শতকরা ৫৲, ৭৷৹ ও ১০৲ টাকা কমিশন থাকে।

কলিকাতা ১৮নং ষ্ট্রাণ্ড্ রোডের 'ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রীজ কোং' সোডা, জমির সার, বিস্কুট, লজেনচুষ, ভেজিটেবল, গুলি, বারুদ প্রভৃতি বহুবিধ মাল বিক্রয়ের এজেন্সী দিয়া থাকে। ইহাদের বিভিন্ন মালের কমিশন বিভিন্ন প্রকার। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই কোং'র মাল বিক্রয় হয়। পূর্ব্বে একই প্রকার মাল বিভিন্ন কোং কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইত এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। তজ্জন্য গত ১৯২৬ সালে ইম্পিরিয়াল ইনডাষ্ট্রীজ কোং গঠিত হইয়া সমস্ত কোং'র মাল এই কোং কর্ত্তৃক বিক্রয় হইয়া প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইয়াছে। ইহাঁদের দর সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোংও ঠিক এই ভাবে গঠিত। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা যখনই দেখিতে পায় যে, বিভিন্ন কোং সৃষ্টির ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তখনই তাহারা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহাতে প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া সমস্ত কোম্পানীই লাভবান হয়। এই সমস্ত অভিনব কৌশল-আবিষ্কারের দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায় পরিচালন করিতে পৃথিবীর মধ্যে ইংরাজ জাতি অদ্বিতীয়।

শুট্‌কি চিংড়ীর ব্যবসায়—মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে ধীবর

[illegible] হইতে ছোট ছোট চিংড়ি মাছ ধরিয়া তদঞ্চলের যে সমস্ত লোক শুটকি চিংড়ীর চালানী ব্যবসা করে, তাহাদের নিকট উহা বিক্রয় করে। চালানী ব্যাপারীরা উহা সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করিয়া কলিকাতায় আমড়াতলায় বোম্বেওয়ালার নিকট চালান করে। তাহারাই ঐ সমস্ত মাল রেঙ্গুনে প্রেরণ করে। ঐ সমস্ত বোম্বে-ওয়ালাদের রেঙ্গুনে আড়ত আছে। উক্ত মাছ বিক্রয় হইলে উক্ত আড়তদার তাহাদের কলিকাতার আফিসে সংবাদ পাঠাইলে ব্যাপারীরা হিসাব করিয়া উহার মূল্য পায়। প্রথম দুই এক ক্ষেপে ব্যাপারীদের বেশ লাভ হয়, এবং সেই লোভে পড়িয়া তাহারা যখন বেশী বেশী মাল আমদানি করে, তখন উক্ত আড়তদারগণ সংবাদ পাঠায় যে ভিন্ন স্থান হইতে মাল আমদানি হইয়া উহা কম দরে বিক্রয় হইয়াছে। তাহাতে ব্যাপারীদের লোকসান হয়। রেঙ্গুনে কি দরে এই সমস্ত মাল বিক্রয় হইতেছে, ব্যবসায়ীরা তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারে না। আড়ত-দারের কথায় বিশ্বাস করিয়াই দাম লইতে হয়। ফলে এই সমস্ত আড়তদারী করিয়া বোম্বেওয়ালাগণ ধনী হইয়া পড়ে আর আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান ব্যাপারীরা লোকসান দেয়।

বাংলায় যদি লিমিটেড্ আড়তদারী কোং স্থাপিত হয়, এবং রেঙ্গুনে ঐ সমস্ত কাজের জন্য উহার ব্রাঞ্চ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে বাংলার এই সমস্ত ব্যাপারীরা বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, এবং আড়তদার কোম্পানীরও বেশ লাভ হয়।

সমাপ্ত